

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সপ্তবর্ণা

সপ্তম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক নিরঞ্জন অবিকারী
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ বান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. সরকার আবদুল মান্নান
ড. শোয়াইব জিবরান
শামীম জাহান আহসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১১

১ম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

২য় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি-পঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবন-বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে সপ্তম শ্রেণির সন্তব্যী শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এসেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং এই জনসোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদা, স্নাতৃভূবোধ ও বিজ্ঞান-চেতনা প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে অনিবার্যভাবেই সংকলিত রচনাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রচনা সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের আলোকে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন কাজের আয়োজন রাখা হয়েছে। কর্ম-অনুশীলন শীর্ষক অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমির বানাননীতি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকটি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই-আউটের মাধ্যমে পরিমার্জিত হলেও তখন সময়স্বল্পতার কারণে বিষয়বস্তুসমূহে কোনো পরিবর্তন আনা যায়নি। এবারের সংস্করণে সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করি বর্তমান শিক্ষাক্রমের আলোকে নতুন বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক শিখন-সাহিত্য পূরণে সহায়ক হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম-অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্য		
১. কাবুলিওয়ালা	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
২. লখার একুশে	- আবুবকর সিদ্দিক	৮
৩. মরু-ভাঙর	- হাবীবুল্লাহ বাহার	১৩
৪. শব্দ থেকে কবিতা	- হুমায়ুন আজাদ	১৮
৫. পাখি	- গীলা মজুমদার	২৩
৬. পিতৃপুরুষের গল্প	- হারুন হাবীব	৩০
৭. ছবির রং	- হাশেম খান	৩৬
৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	- সেলিনা হোসেন	৪১
৯. সেই ছেলোট	- মামুনুর রশীদ	৪৬
১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	- এ. কে. শেরাম	৫২

কবিতা

১. নতুন দেশ	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
২. কুশি-মজুর	- কাজী নজরুল ইসলাম	৬২
৩. আমার বাড়ি	- জসীম উদ্দীন	৬৬
৪. শোন একটি মুজিবরের থেকে	- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	৭০
৫. সবার আমি ছাত্র	- সুনির্মল বসু	৭৪
৬. শ্রাবণে	- সুকুমার রায়	৭৮
৭. গরবিনী মা-জননী	- সিকান্দার আবু জাফর	৮১
৮. সাম্য	- সুফিয়া কামাল	৮৬
৯. মেলা	- আহসান হাবীব	৮৯
১০. এই অক্ষরে	- মহাদেব সাহা	৯৩

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরওয়ান কাককে কোয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?”

সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগতুম-বাগতুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগতুম-বাগতুম শেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া পেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।”

ময়লা চিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, তুলি ঘাড়, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাজ, এক লখা কাবুলিওয়াল পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারন্ধের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ফখাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া গিল।

মিনির চিব্বাকারে যেমনি কাবুলিওয়াল হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ফখাসে অস্ত্রপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ তুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অস্ত্রপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা বেঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি তুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, বিগুণ সদোহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুইটাটি ঘরের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়াল তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে তনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেজাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র কদম্বটুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে শুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়াল, ও কাবুলিওয়াল, তোমার ও তুলির ভিতর কী।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মনিকে বলিত, “যৌষী, তোমি সসুরবাড়ি কখনু যাবে না!”

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া হুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি স্বত্তরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক স্বত্তরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আঞ্চালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

তনিয়া মিনি স্বত্তর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দূরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়াল সখাছে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাবিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া গ্রন্থশিটি সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল তন্দা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়াল বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি ঘরের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে তুলিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই সেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবানীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রকৃত হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি স্বত্তবর্ণাভির যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একশ্রকার তুলিয়া গেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে বুলি নাই, তাহার সে লথা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া বাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁচীকে একবার দেখিতে পাইব না?”

আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।”

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। শুকভাবে দাঁড়াইয়া একবার হিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আত্মর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁচীর জন্য অনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও



একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওয়া করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মন্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত ঢালাইয়া দিয়া বকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সবন্ধে ভাঁজ খুলিয়া দুই হাতে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেবিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোমাক নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুবা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

দেবিয়া আমার চোখ হুলহুল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভ্যপূর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অভ্যপূরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাস্তাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবৈশী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেবিয়া কাবুলিওয়াল প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সুসুসবডি যাবিস?”

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে নিলাম। দেবিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

কাবুল	—	আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়াল	—	কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজ নিয়ে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড	—	মুহূর্ত।
নভেল	—	উপন্যাস।
সত্তদশ	—	সতের।
পরিচ্ছেদ	—	অধ্যায়।
পার্শ্ব	—	পাশে।
কন্যারত্ন	—	কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	—	ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
উর্ধ্ব্বাসে	—	অতি দ্রুতবেগে।
অন্তঃপুর	—	বাড়ির ভেতরের অংশ।
অভিহ্রায়	—	ইচ্ছা।
খোবানি	—	বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা	—	কন্যা।
দার	—	দরজা।
সমীপস্থ	—	নিকটে, কাছে।
অনর্গল	—	অবিরাম, অনবরত।
সহস্যমুখ	—	হাসি মুখ।
পঞ্চবর্ষীয়	—	পাঁচ বছর বয়সী।
খোবী	—	কাবুলিওয়াল কতৃক 'খুকি' শব্দের অশুভ উচ্চারণ।
স্বভাববিরুদ্ধ	—	স্বভাবের বিপরীত।
মুষ্টি আকালন	—	জোরে মুষ্টি নাড়ানো।
নিঃসংশয়	—	শঙ্কাহীন।
কিঞ্চিৎ	—	অল্প।
ধারিত	—	ধ্বংসপ্রাপ্ত।
প্রফুল্ল	—	আনন্দিত।
লড়কী	—	মেয়ে।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। ‘কাবুলিওয়াল্লা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভেতরের স্নেহস্বপ্ন মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশপালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের বা যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালবাসেন। সন্তানের মঙ্গল-চিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। ‘কাবুলিওয়াল্লা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃহৃদের সার্বজনীন ও চিরন্তন রূপকে উন্মোচিত করেছেন।

লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু ‘শিক্ষা ও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত- সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অন্যান্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। ধ্রুপদীকেনন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কিশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর। (একক কাজ)
- খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিতরীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর। (দলীয় কাজ)।
- গ. সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কাবুলিওয়াল্লা’ গল্পে শক্তির স্বভাবের মানুষটি কে ?

ক. রহমত	খ. মিনির মা
গ. রামদয়াল	ঘ. মিনির বাবা

২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন ?

- ক. মিনির খুঁড় বাড়ি যাচ্ছে বলে
 খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
 গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
 ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিতকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি হেলোটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় হেলোটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে উঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি হেলোটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে ‘কানুলিওয়ালা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে ?

- ক. রহমত
 খ. রামদয়াল
 গ. লেখক
 ঘ. মিনি

৪. উদ্দীপকে ‘কানুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে ?

- i. সম্ভান বাৎসল্য
 ii. সহমর্মিতা
 iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
 খ. i ও iii
 গ. ii ও iii
 ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে হেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি খামীকে বোঝান- বিভিন্ন ফন্দি করে মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

উদ্দীপক-২ : বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় ঘোণাঘোণ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কান্দতে কান্দতে বলে- ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’

ক. কানুলিওয়ালার মলিন কাণজটিতে কী ছিল?

খ. রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপক-১ অংশে ‘কানুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কানুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে’— বিশ্লেষণ কর।

লখার একুশে আবুবকর সিদ্দিক



লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম লেপে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা শানে শুয়ে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।

বাপকে লখা দেখে নি। চেনে না। মা তার ত্যানাখানি গরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেজে ফেরে। লখার দিন কাটে শুনি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের ঐটোপাতা চেটে। রাতে মায়ের পাশে লখা খিদের কষ্ট ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার, সে আজ ভোররাতে মায়ের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মা মুখ হাঁ করে যুসুছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ধোঁয়া-ধোঁয়া কুমাশার মধ্যে।

খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন যেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইম্পাতে লাইনে ঠুক-ঠুক ঠুকে তার উপর কান পাতল। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভাবি মজার দুই ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। সেখানে মন্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গড়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ধাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অন্ধকার। কীকি পোকা ডাকছে আর খেড়ে খেড়ে গাছের কীকড়া ছায়া মাখা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।

খচ করে কাঁটা ঢুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উবু হয়ে বসে কাঁটাটা খসিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিশ্ব ভো যায় না। কী অসহ্য ব্যর্থতা। আঁ আঁ বলে কেঁদে দিলো লখা। কিন্তু কান্দলে ভো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অন্ধকার। কিনকিনে ঠাণ্ডা। পাছের পাতা বেয়ে শিশির

পড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজ়ে শীত লাগছে। একটা ছাঁচড়া ডাল লখার হাফপ্যাক্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আখবসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।

একটা বেকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেখটায় সেই অদ্ভুত গাছটার নিচে পৌঁছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা ভুলেমিঠের মতো বড় বড় থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলতুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একই পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবধি তোমরা এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুক চটচটে ঠাণ্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছের ডালপালা কঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। পর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। চৌটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে খুঁদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাঁদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, পাড় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলছে — আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটো না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটবে কী করে? লখা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে — অ আ ক খ। বাইরে শব্দ হয় — আঁ আঁ আঁ আঁ।

শব্দার্থ ও টীকা

শান	-	পাথর। এখানে কব্জিটে তৈরি ফুটপাথ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি	-	পুরানো ছেঁড়া কাপড়।
ভিঝ	-	ভিচ্কা, ঝররাত।
মেঙে	-	চেয়ে।
গুলি খেলা	-	মার্বেল দিয়ে খেলা।
ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার	-	যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভীত।

- বিষ - যে পদার্থ শরীর দুকলে যে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মারাও যায়। এখানে পথে কাঁটা ফোটার জন্য 'ব্যথা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
- তুলোমিঠে - তুলোর মতো দেখতে এবং মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে 'হাওয়াই মিঠাই'-ও বলে।
- মগডাল - গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।
- গাড় - ঘন।
- প্রভাত ফেরি - ভোরবেলা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলার অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্রভাতফেরি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তান। তখনকার সরকার সে-দাবি মানে না। তখন ছাত্র-জনতা তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। সেই আন্দোলন চরমে ওঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে তৎকালীন সরকারের পুলিশ ভুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। তারই স্মরণে প্রতিবছর ২১এ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি করা হয়। প্রভাতফেরির সময় সকলের কণ্ঠে থাকে আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদের সুর করা গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ছুঁলিতে পারি'।
- শহিদ মিনার - শহিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সন্নিগটে আমাদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

গল্পটিতে একুশে ফেব্রুয়ারির অবিদ্যমান প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার হুঁশ দিয়ে আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাজলির গর্বে উচ্চারণ — 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'জলরাফস', 'খরাদাহ', 'একাত্তরের হৃদয়ভঙ্গ', 'বারুদ পোড়া গ্রহর' ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
 খ. শহিদ দিবস উপলক্ষে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদির সমন্বয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লখা কখন তার বিদের কষ্ট ভুলে যায় —
 ক. যুমুতে গেলে খ. মাকে কাছে পেলে
 গ. খেলার সঙ্গী পেলে ঘ. প্রভাতফেরির গান শুনেলে
২. লখাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ —
 ক. সে ভয় পেয়েছিল
 খ. বাইরে অন্ধকার ছিল
 গ. তাকে ফুল আনতে হবে
 ঘ. মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোপাল। ওর কণ্ঠে গানের সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে চায়।—

৩. লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো —
 ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা
 খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ
 গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা
 ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আশ্রয়
৪. দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবুও লখাই প্রমাণ করেছে যে —
 i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী
 ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়
 iii. শিতরা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ

কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদ্‌যাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত — বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা জনত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও তার ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।
 - ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?
 - খ. 'জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার'। — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
 - গ. 'লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।' — ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. 'ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।' — বিশ্লেষণ কর।

মরু-ভাষ্কর হবীবুল্লাহ বাহার



যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাব পৃথিবী ধন্য হয়েছে – মানুষের জীবনে যারা এনেছেন সৌন্দর্য, স্মৃতিয়েছেন লাভন্য, মরু-ভাষ্কর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হযরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ঘটনাটি বিবরণ যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কঠিণাখরে ঘষে যেভাবে বাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয়নি।

আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা আরবিরা লজ্জার কথা বলে মনে করতে। সাহাবিরা এবং অন্যান্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

হযরত মোস্তফা (স.) মানবতার পৌরব। আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হযরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবজমির অবিসংবাদিত নেতা। হযরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল – একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।

হযরতের চরিত্রে সর্গমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সঙ্ঘামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার সেখতে পাই – কুসুমের চেয়েও কোমল। বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই – মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলোপিলের সঙ্গে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে – পথে দেখা হলে বালক-বন্ধুকে তার বুলবুলির খবর জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভুল হয় না। বন্ধুবিয়োগে

চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে ‘মা আমার, ‘মা আমার, বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হযরত অভয় দিয়ে বললেন : ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনবও নই – এমন মান্নের সন্তান আমি, শুধু খাদ্যই যার আহ্বার্থ।

হযরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি – কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হযরতের চাকরি করার পর বলেছেন – এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হযরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি। কখনও। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হযরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা করো।

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রাসুলুল্লাহ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুহাম্মদিনি নিযুক্ত করেছেন হাবশি পোলাম হযরত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হযরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হযরত ঘোষণা করেছেন: বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।

কুসংস্কারকে হযরত কোনো দিনই গ্রহণ করেননি। একবার হযরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যমহল দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে – সুখি হযরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবশে পরিধান করেছে। তখনি সভা ভেঙে হযরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, “আল্লাহর বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি – চন্দ্র ও সূর্য। কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র – সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।”

হযরত জ্ঞানের গুণের জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো – তাকে তিনি ঝুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

এইভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

মক্কা-ভাকর-	মক্কা-ভাকর- মক্কা-ভাকর- মক্কা-ভাকর- মক্কা-ভাকর-
সৌতব-	সৌতব- সৌতব- সৌতব- সৌতব-
কটিপাথর-	কটিপাথর- কটিপাথর- কটিপাথর- কটিপাথর-

সুদাহি-	পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।
অকুতোভয়-	যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নিশ্চীক।
অভিসম্পাত-	অভিশাপ।
পরিদ্রাণ-	যুক্তি।
হাবশি গোলাম-	আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাস।
লহু-	রক্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

মহামানবদের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

পাঠ- পরিচিতি

‘মক্-তাক্বর’ গ্রন্থে লেখক মহানবীর জীবন ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রবান; মানবশ্রেণী, জীবশ্রেণী মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাহিনিক নানা ভাষ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

আত্মাহর মহান নবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।

তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবল্ল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সজ্ঞামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বন্ধু-বান্ধব, শিশু কিশোর, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্বীণিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন।

হযরত মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্ষে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিদ্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হযরত কুসংস্কারকে কখনও প্ররোচ দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিহীন, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হযরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এমনকি শহীদ হওয়ার চেয়ে জ্ঞানসাধনাকে তিনি দিয়েছেন অধিকতর গুরুত্ব। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার শ্রেণ্যে উজ্জীবিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

হবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন কবি নজরুলের ‘ভক্ত শিষ্য’ এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন।

যেমন 'ওমর ফারুক', 'আমীর আলী ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এহিল তিনি পরলোকগমন করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ৫টি কাজের তালিকা কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন?

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে | খ. নারীর মর্যাদারক্ষায় |
| গ. সত্য ও সজ্ঞামের চেতনায় | ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় |

২. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু - এদের ক্ষমা কর' - উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরত (স.) চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা | খ. দয়া ও করুণা |
| গ. শ্রেম ও ভালোবাসা | ঘ. বাস্তবতা ও ন্যায়বিচার |

৩. 'কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না' - উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ক. সাম্যবাদিতার | খ. মানবশ্রেমের |
| গ. সংস্কারমুক্তির | ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের |

৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা - ছিল অসাধারণ?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. সহিংসতার | খ. ধৈর্যের |
| গ. পেশিকতার | ঘ. শৃতিশক্তির |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছোট শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আচরণ কীরূপ ছিল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসূল (স.) এর আদর্শ কতটুকু ফলদায়ক যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর।

শব্দ থেকে কবিতা হুমায়ুন আজাদ



কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-লেখাগুলো, পঙ্ক্তিগুলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঙ্ক্তি আরেকটি পঙ্ক্তির সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর জোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কান্না লেখেন? কবিতা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলসে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলা। তেমনি কবিতা বানাতে হলো জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ — রবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সেই হতে পারে কবি। কবিতা গোলাপের মতো

সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, তাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, তাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আলর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গছভরা কথা বলতে, তাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নুপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরায়: কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালায় সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পারের নুপুরের মতো বাজে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাঙলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরায়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালটাপার মাখ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, চিনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে দেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিছু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানখেতটা, পোখা বেড়াটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো: আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম:

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুক লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে : চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুক লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পঙ্‌ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম :

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নুপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। ‘গোলাপ ফুলের মুখের রূপ’ বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পারো। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোট, এ-ছোট থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোট সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটে। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছোট, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পারো, দেখ। দেখ, দেখ এবং দেখ। বৃকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোট বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোট বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোট বয়সে বৃকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড় হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতার রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

উপমা	—	তুলনা। এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
নুপুর	—	পায়ে পরার অলংকার।
চমকপ্রদ	—	যা অবাক করে দেয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিকারীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তাই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।

কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তারাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিরই চোখে খেলা করে বলে তারা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবির চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়ারী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা।

অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুটোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক ও কবি হুমায়ূন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ূন আজাদ দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : কাব্য — ‘অলৌকিক ইস্টিমার’, ‘জুলো চিতাবাঘ’, ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’, ‘কাফনে মোড়া অশ্রুবিপ্লব’, উপন্যাস — ‘জাপান হাজার বর্গমাইল’, গল্প — ‘যাদুকের মুহূর্ত’, প্রবন্ধ — ‘লাল নীল দীপাবলি’, ‘কতো নদী সরোবর’ ইত্যাদি।

হুমায়ূন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না-লাগাগুলো যুক্তিসহকারে লেখ।
- খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে ?

ক. কথা	খ. কৌশল
গ. শব্দ	ঘ. ছন্দ

২. 'তধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে।' - এ বাক্যে বেচা কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. বিনিময় প্রথা | খ. ক্রয়-বিক্রয় |
| গ. দেনা-পাওনা | ঘ. আদান-প্রদান |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরির গান
পুলক মোর সকল পায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।

৩. কবিতাংশে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় ?

- | | |
|------------------|--------------------|
| ক. শব্দ প্রয়োগে | খ. ছন্দের ব্যবহারে |
| গ. সাবলীল ভাষা | ঘ. উপমার প্রয়োগ |

৪. উপর্যুক্ত বিষয়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ক. ছবিও আরও রঙিন | খ. দুলে দুলে আসছে |
| গ. খেলতে শব্দের খেলা | ঘ. যত পারো দেখ। |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভেতর সাজাতে পছন্দ তার। মাহফুজার ভাইপো নির্ঝর তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্ঝরকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্ঝর ফুফুকে পেলেই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্ঝর তাকে বলে "ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?" মাহফুজা উত্তর দেন, "তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্বপ্নময় শব্দগুলোকে বুকের ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।"
- কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন।
- কবিতার জন্য দরকার শব্দ - রংবেরঙের শব্দ - বুঝিয়ে লেখ।
- কবিতার বিষয়ে নির্ঝরের প্রশ্নের উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- লেখ।
- মাহফুজার উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে কি? মুক্তিসহ বিচার কর।

পাখি শীলা মজুমদার

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিখত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কী করে?

মাসিরা মাকে বললেন—“কিছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন শুকে ঝাড়া তিন মাস সোনাখুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন ঢাঙ্গা হয়ে উঠবে।”

বাবাও তাই বললেন, “বাবু, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।”

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় সিনিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, “পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।”

মাসিরা বললেন, “বেঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?”

হাসি, রক্তা সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাখুরিতে সিনিমার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মস্ত জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। আন্তে আন্তে পাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝুপ করে জলে নামছে।

এক ছড়া কী ঘেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, “ওই দেখ, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।”

কুমু বলল, “বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে।”

সিন্মাও তখন ঘরে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা।”

কুমু বলল, “কোথেকে এসেছে ওরা?”

“বেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিক্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বলল—“আবার শীতের শেষে বাকৈ বাকৈ সব ফিরে আসে, সেকথা তো বললে না ঠাকুরমা?”

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম দুম করে বনুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের বাক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।

পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেল, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবু গাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বকের রঙটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একেবারে কুমুর চোখের নিকে একদুট্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু খুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা ধরতর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টনটন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, “তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।” পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।

লাটু কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।”

কুমু বলল, “কিছু দিম্মা কী বলবেন?”

“কী আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!”

কুমু জোর গলায় বলল, “নিচয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিচয় বাঁচে।”

লাটু বলল, “কোন গরম জায়গায়?”

“কেন আমার বিছানায়, লেগের মধ্যে।”

“দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।”

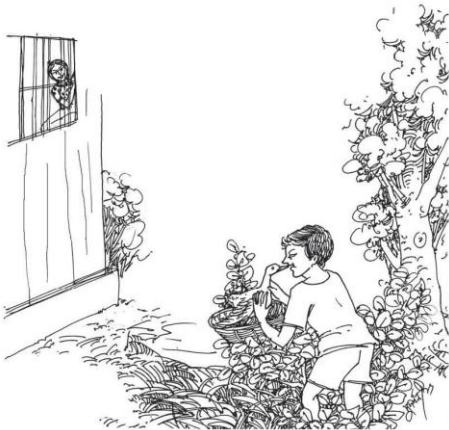
“কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?”

“তোমার যেমন বুদ্ধি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?”

“কী বাবে ও লাটু?”

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!

“এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? বুদ্ধি দিয়ে, লেবু গাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তা হলে ভাতা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।”



নিমেষের মধ্যে খুড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কী তার ডানা ঝটপটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আত্তে আত্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে টোটে গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলসে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, “ঠাকুরমার কাছে বেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ছুঁস না গুটাকে।”

কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ভর বহুসের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইচ্ছুলে যেত, সন্ধ্যাবেলার সাঁতার শিখত, দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু দৌড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পারে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিখতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে একটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আর একবার জানালায় কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটিকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা বুড়িতে বসে আছে আশে আশে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকোর পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুষ করে চোখ বঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেল।

কুমু বাগিশের তলা থেকে ছোট বিকুটের বাস থেকে একটুখানি বিকুট ছুড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাখর হয়ে জমে গেল। বিকুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাসে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকোর পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেল।

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বৃষ্টি দিম্বা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, “কেলে সে ওটাকে, বড় নোহো, বুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে?”

কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা মুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানালায় বাহিরে শোরশোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বৃষ্টি বেড়াল পাখিটা খেল। কিন্তু থাকবে কী, অত বড় পাখি তার তেজ কত! দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

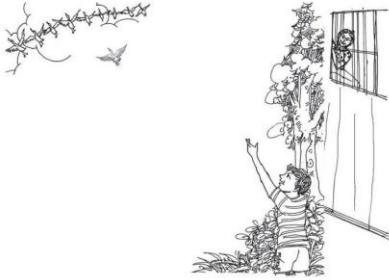
কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, বোঁড়া তো হয়েছে কী, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোয় বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিষভের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়, বুনা হাঁসের ডানা আশে আশে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা খুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাঠি তখনও ফুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানালায় ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে খুলে থাকার পর আঁচরে-পাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাঠি ফিরে এসে আবার ওকে তুলে খুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোঁটরাগাও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওখুঁধ লাগিয়ে দিল লাঠি।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, খুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক করে। বাড়িতে চিঠি লেখে, “মা বাবা, ভোমরা ভেবো না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রত্নাদ্বার বেলো আমি পরীক্ষা দেব।”

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা খুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে দুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, দিবা ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনা হাঁস তীরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখনই আবার নেমে এসে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।



সারা রাত বুনো হাঁসরা কিরাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গে নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যেরকম উড়তে লাগল, কুমু লাহির মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা যেন একটু ছোটই মনে হল।

কুমু বলল, “দিম্বা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।”

তবে দিম্বা তো অবাক! তখন লাহি আর কুমু দুজনে মিলে দিম্বাকে পাখির গল্প বলল। দিম্বা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দিম্বা	—	এখানে দিদিমাকে “দিম্বা” বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
এক ছড়া	—	এক গুচ্ছ।
আন্দামান	—	ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ভারতের একটি দীপাঞ্চল। সমুদ্রবেষ্টিত এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।
অবধি	—	পর্বন্ত।
একদুটে	—	এক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ চোখের পলক না ফেলে।
নিমেধ	—	মুহূর্ত।
বিষত	—	আধা হাত পরিমাণ।
শোরশোল	—	চিৎকার, চোঁচামেচি।
আঁচরে-পাঁচড়ে	—	অনেক চেষ্টা করে।
মগডাল	—	উপরের ডাল।

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রাণীদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

‘পাখি’ গল্পটি লীলা মজুমদারের ‘চিরকালের সেরা’ গল্প-সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গল্পের কিশোরী কুমু অসুস্থ হলে তা নিয়ে দুর্ভিক্ষায় পড়ে পরিবার। সহপাঠীরা সবাই উপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু নিচের ক্লাসে পড়ে থাকবে— এই নিয়ে কুমুর ভাবনার শেষ নেই। দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু সোনামুড়িতে দিদিমার দোতলা বাড়ির উন্মুক্ত পরিবেশে এলে একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সন্মুখীন হয়।

শিকারীর বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমবয়সী কিশোর লটির সহযোগিতা নিয়ে কুমু পাখিটিকে সকল বিপদ থেকে বাঁচাতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠায় সাহায্য করে। গল্পটির একটি অসাধারণ দিক হচ্ছে— পাখিটির সেরে ওঠার প্রতিটি ধাপ থেকে কুমু নিজেও সুস্থ হবার প্রেরণা পায়। পাখিটির প্রতি দুজন কিশোর-কিশোরীর অক্রিম মমত্ববোধ ও সমবেদনা গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।

লেখক-পরিচিতি

লীলা মজুমদার ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহে। তিনি শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাইবো। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু বই: ‘হলদে পাখির পালক’, ‘দিনদুপুরে’, ‘বলিনাথের বাড়ি’ ‘গুপির গুপ্তখাতা’। আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা, নির্মল হাস্য-কৌতুক এবং গল্প বলার চতুর কারণে শিশু-কিশোর সাহিত্যে তিনি এক ঈর্ষণীয় আসন তৈরি করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- তোমার পছন্দের প্রাণীসমূহের তালিকা কর।
- বিভিন্ন সময় মানুষেরা কোন কোন প্রাণীর প্রতি কী ধরনের বিক্রম আচরণ করে থাকে?
- প্রাণীদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত?

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কুমুর ধারণা অনুযায়ী দিদিমা কাকে পাখিটি ফেলে দিতে বলবেন -

ক. মা	খ. মজল
গ. লাইট	ঘ. মাসীমা

২. লাটু পাখিটির ডানায় চুন-হলুদ বেঁধে দেয়। কারণ এটি -

- i. ক্ষত স্থানের জন্য উপকারী
- ii. পাখিটির ডানা রঙিন করবে
- iii. গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবুতর পোষার শখ কামালের। শুরুর্তে এক জোড়া কবুতর সে খাঁচাতেই পুষত। বলতে গেলে একসময় এটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। তাই কবুতরের আরামদায়ক বসবাসের জন্য কাঠের খোপ বানিয়ে দেওয়ালে টানিয়ে দিয়েছে কামাল। এখন তার পাঁচ জোড়া কবুতর।

৩. উদ্দীপকে ‘পাখি’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- ক. পাখি পোষার শখ
- খ. পাখির প্রতি মমত্ববোধ
- গ. পাখির প্রতি সমবেদনা
- ঘ. পাখির পরিচর্যার ব্যবস্থা

৪. উক্ত প্রতিফলিত দিকটি ‘পাখি’ গল্পের কোন চরিত্রসমূহে বিদ্যমান ?

- i. মা-দিদিমা
- ii. কুমু-লাটু
- iii. লাটু-দিদিমা

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১। সহপাঠীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিভীষণ ছানার করুণ ডাক শুনে খমকে দাঁড়ায় শ্রেয়সী। হঠাৎ সেখান থেকে পাশে একটি গর্তে একটি বিভীষণ ছানা আটকে আছে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্রেয়সী সেটিকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে ফেরার পর শ্রেয়সীর সেবা-যত্নে বিভীষণ ছানাটি যেন গ্রাণ ফিরে পেল। খুব অল্প সময়ে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। কিন্তু ওর ভাই সুজা তাকে সহ্য করতে পারত না, প্রায়ই মারধর করতো। একদিন শ্রেয়সী স্কুল থেকে ফিরে বিভীষণ ছানাটিকে আর খুঁজে পেল না।

ক. হাঁসরা গিয়ে কোথায় নামল ?

খ. কুমু-লাটুর মনে কোন সন্দেহ রইল না কেন ?

গ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে ‘পাখি’ গল্পের কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মত হলে বিভীষণ ছানাটিকে হারাতে হতো না শ্রেয়সীর’ বিশ্লেষণ কর।

পিতৃপুরুষের গল্প হারুন হাবীব

অন্তর মামা বড় বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদিই চাকরি না হয়। কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভাল লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁখে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেরের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরো কত কি। অন্তর নানা কত বকতেন, ‘বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।’

‘বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই।’ সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।

সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প সুনবার জন্য অধীর অগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্তর। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, ‘তুই এক কাজ কর অন্তর। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরো বল, তুই যুদ্ধের গল্প সুনবার জন্য অধীর অগ্রহে বসে আছিস। দেববি ঠিক আসবে।’

বুঝিটা অন্তর মার হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক’দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্তর চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিন দিন বাসেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্তর বরাবর রাত ন’টা-সাত্বে ন’টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, ‘ঘুমাতে বাস নে কেন?’

অন্তর খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম।

ভোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

মামা বললেন, ‘ভাল আছিস তুই অন্তর? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।’ অন্তর বলে, ‘আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দু’দিন বাসেই একুশে ফেব্রুয়ারি।’

মামা বললেন, ‘ঠিক আছে বানিকম্প রেস্ট নিজেই বেরবো তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচ দিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চার দিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাবি যাব। যত গল্প সুনতে চাস শোনাব।’

মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্তর আর কাজল মামা। লালমাটিয়া-ধানমন্ডি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, ‘এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?’

‘কি যে বলো মামা। জানব না কেন।’

‘ঠিক আছে বল দেখি সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?’



‘তা তো ঠিক জানি না।’

‘এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভাল আমাদের। অতীত মানে আমাদের আগের দিন। পুরনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।’

কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোঘল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে একটা সাতপন্থজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকতেই অস্ত্র জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?’

‘হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করে?’

‘মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুঁজে গিয়েছ।’

‘অস্ত্র, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায় এক দেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ-লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায় অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।’

দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকোয়া হল আর শামসুন্নাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌঁছাল। কাজল মামা বললেন, ‘এই যে ডান পাশে বিকিটো দেখছি ওটার নাম কি জানিস?’

‘না।’

‘জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।’

‘তুমি থাকতে এখানে?’

‘না। আমি থাকতাম হাজী মোহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।’

‘কেন?’

‘কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্রেরা যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হল ওরাই প্রথম।’

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দুদিন বাসেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মামা বললেন, ‘অস্ত্র এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে বাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তীক্ষ্ণা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।’

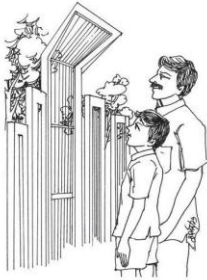
মামাকে বলে, ‘মামা এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?’

‘আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অস্ত্র, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?’

‘মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।’

অস্ত্রর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘তুই তো বেশ কিছু জানিস অস্ত্র। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হল আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটার যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে। চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজ়ে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।’

অস্ত্রর মুখ দেখে কাজল মামা বৃন্দলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অস্ত্র। মামাকে বলে, ‘মামা, তুমিও তখন এখানে ছিলে?’



‘নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোট। এখানে যাঁরা বাহাল্ল সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।’

কাজল মামার হাত ধরে অস্ত্র একের পর এক সিঁড়ি ভিড়িয়ে শহিদ মিনারের ওপরে গঠে। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কাহিনি শুনে সে আত্মহী হয় নিজ আতির অতীত সঙ্ঘামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অস্ত্র বলে, ‘তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।’

‘একুশে ফেব্রুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এইকুই বলি — এই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তাই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সঙ্ঘাম শুরু হয়। সেই সঙ্ঘাম আরো উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।’

‘সেই মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?’

‘হ্যাঁ আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।’

‘বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় কিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?’

‘ঠিক।’

শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অস্ত্র জুতো পরে নেয়। কিরে আসার সময় মামা বলেন, ‘অস্ত্র চল, আমরা দু’জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।’

অস্ত্র ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানান।

(সহক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- হানাদার বাহিনী — অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
- তিতিকা — সহনশীলতা।
- সামরিক শাসন — সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।
- পিতৃপুরুষ — পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানানোর আশ্রয় সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পটির কিশোর অস্ত্র ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সঙ্গ্রামের গল্প শুনে অস্ত্রের মনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আশ্রয় জাগে। সে মামার জন্য অধীর আশ্রয়ে অপেক্ষা করে। এক সময় একুশে ফেব্রুয়ারির দুদিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অস্ত্রের অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অস্ত্র জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাজ্যের নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী জুমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ছুরতে ছুরতে কিশোর অস্ত্র স্মৃতিসৌধ, মাতৃভাষা আন্দোলন, শহীদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

লেখক-পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক হারুন হাসীম একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১ এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: ‘প্রিয়যোদ্ধা’, ‘ছোটগল্পসমগ্র ১৯৭১’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নির্বাক প্রবন্ধ’, ‘Blood and Brutality’ ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত – ১০টি বাক্যে তা লেখ।
- খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোন একজন মুক্তিযোদ্ধার সফল জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- মোঘল আমলে ঢাকার নাম ছিল

ক. বাবরনগর	খ. হুমায়েননগর
গ. আকবরনগর	ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

ছবির রং হাশেম খান



ছবি আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে!

কাগজ তো সাদা। পেনসিলে আঁকা যায়। হাতের কলমটা দিয়েও আঁকা যায় এই সাদা জমিনে।

রং হলে খুঁড়ব ভালো হয়। ইচ্ছে যতো লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো রং ঘষে ঘষে সাদা কাগজটা ভরে ফেলা যায়। সুন্দর এক রঙিন ছবি আঁকা হয়ে যায়।

হলুদ, নীল ও লাল এই তিনটিই কিন্তু আসল রং। এই তিন রং থাকলে নানা রঙে ভরা পরিপূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা যায়। এই তিনটি রং মিশিয়ে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়। যেমন —

হলুদ ও নীল মেশালে পাবে সবুজ।

নীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি।

লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা।

এভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি রং বা একাধিক রং মিশিয়ে কত রকম রং যে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি রং ছাড়া সবগুলো সঠিক নামে চেনা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে — লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটিই হলো মৌলিক রং বা প্রাথমিক রং। সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক রং এবং অন্যান্য রং পরবর্তী পর্যায়ের।

সাদা ও কালো হল ছবি আঁকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক রং মিশিয়ে মিশিয়ে এই দুটো রং পাওয়া যাবে না। তবে সবুজ ও লাল মন করে মিশিয়ে কালোর কাছাকাছি পাঁচ একটি রং তৈরি করা সম্ভব।

রংধনুর সাতটি রং । বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু হুটে ওঠে একটি একটি করে গুণে সাতটি রং বুজে বের করা যায় । হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও গোলাপি ।

বাংলাদেশে ষড়ঋতুর দেশ । বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি ।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল । আবহাওয়া থাকে শুষ্ক ও গরম । বৃষ্টি হয় কম । গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায় । প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায় । আবার হঠাৎ করে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাহুটি, বিন্দুৎ চমকানো, সঙ্গে কানে তাল লাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয় । তারপর ঝড় ও বৃষ্টি । প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে । রং-বেরঙের ফল — আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায় । লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি ।

বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস । ঝিরঝিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝর ঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময় । মাঠ-মাট-নদী নালা খিল-বিল পানিতে টইটুঁমুর । পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায় — নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ধানক্ষেত, পটিক্ষেত ইত্যাদি । সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা ঋতুর ফুল । এই ঋতুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে চমৎকার লাগে দেখতে । কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুবাদ ।

শরৎকাল — সাদা ও সাদা নীলের ছড়ছড়ি । ভদ্র ও আশ্বিন — এই দুই মাস শরৎকাল । এ সময়ে বৃষ্টি বসে যায় । সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায় । গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই ঋতুতে ঝকঝকে । নদীর ধারে ও বিলে অল্প পানিতে কাদা মাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল । বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে । বিলে, পুকুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে । বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে — যা দেখতে খুবই সুন্দর । ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয় ।

হেমন্ত ঋতু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস । সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে । ঋতুর শেষ দিকে — অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা গেরুয়া রঙের বাহার । ধান পেকে গিয়েছে । চাষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে ।

এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস — শীতকাল । বনে জঙ্গলে, বাড়ির আড়িনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয় । এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত চলতে থাকে । শিমুল, পলাশ আর কুম্ভুড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলুদে গাছের ঝলমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উৎসবে মেতে ওঠে । মাঠে ভিলের ক্ষেতে সাদা ও হালকা বেগুনি ফুল এবং সরষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই শীতকালেই । শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য । লাল, নীল, হলুদ, কালো বিভিন্ন রঙের গরম কাপড় ও টুপি ব্যবহার করে মানুষ ।

শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে ঘোঁরাটে ধরনের এক মায়াবি রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠাণ্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে বিলে নদীতে — যাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।

ফাছন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়ঋতুর শেষ ঋতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা — কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছোটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঙিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণায় মানুষও স্বভাবসুলভ আনন্দে মেতে ওঠে। বাসন্তী ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজ-সজ্জায় উৎসবে মেতে ওঠে। তাই বসন্ত ঋতুই হলো রঙের ঋতু।

অনেক কাল আগে থেকেই — বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে আমাদের পরিবেশে, নিসর্গে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে — রূপের রকমফের ঘটে চলেছে — তা বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের প্রাণী সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লাক্ষীসরা, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, পাটি, গল্প বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে।

তাঁতে তৈরি কাপড়ে তাঁতেরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি তাঁতের পোশাকে রঙিন সুতার বুনটে নানা রঙের ঝলমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিল্পীরা এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিল্পদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং যেখা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিল্পদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়।

চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাণ চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিত্তে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

খুঁউব	-	খুব। জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে খুঁউব।
মৌলিক রং	-	যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটে নি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড়	-	ছয়।
প্রচণ্ড	-	কড়া, কঠোর।
গেরুয়া	-	মেটে।
বাহ্যর	-	শোভা, সৌন্দর্য।
সর্বত্র	-	সব জায়গায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

স্বত্বভেদে প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

আমরা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঙে নিজের মতো বোঝা আঁকেন তাঁদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন স্বত্বভেদে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চিত্রশিল্পী তাও তাদের ছবিতে রঙ-রেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবির সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্র্যের কথাই লেখক হাশেম খান তাঁর 'ছবির রং' লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক-পরিচিতি

শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই: 'ছবি আঁকা ছবি লেখা', 'জয়নুল গল্প', 'গুলিবিদ্ধ ৭১'।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. প্রকৃতি নির্ভর ছবি, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- খ. প্রকৃতি নির্ভর ছবি একে প্রশংসার আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- গ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী?
 - ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি
 - খ. লাল, হলুদ ও কমলা
 - গ. লাল, নীল ও হলুদ
 - ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ
২. অধ্যয়নে মাঠে গেলো বাহার দেখে বোঝা যায়-
 - i. আকাশে রংধনু উঠেছে
 - ii. মাঠে ধান পেকেছে
 - iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রং বেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোন পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় উল্লিখিত কোন ঋতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. বর্ষাকাল | খ. শরৎকাল |
| গ. শীতকাল | ঘ. বসন্তকাল |

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে ?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. মায়াবী পাখি | খ. রংবেরঙের পাখি |
| গ. বসন্তের পাখি | ঘ. অতিথি পাখি |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গত ভিসেখরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ার বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার স্কুলে নিয়ে যান। স্কুল গ্রাউন্ডে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুগ্ধ হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

- | |
|---|
| ক. চাষীরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে? |
| খ. 'এ দেশের প্রকৃতি নানারূপে প্রতিফলন ঘটিছে।' – বুঝিয়ে লেখ। |
| গ. স্কুলের দৃশ্যে কোন ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়? |
| ঘ. 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।' – 'ছবির রং' প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। |

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেলিনা হোসেন



রোকেয়া ১৮৮০ সালে রাংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আশী সাবেক প্রভুত সুসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁদের বাড়িটি ছিল বিশাল। সাড়ে তিন বিঘা জমির মাঝখানে ছিল তাঁদের বাড়িটি।

রোকেয়া যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। মেয়েদের অবস্থান ছিল বুঝই শোচনীয়। পর্দাগ্রহণ কর্তারভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু মেথারী রোকেয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল লেখাপড়ার প্রতি।

রোকেয়ার বড় দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বোনদের আগ্রহ দেখে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের বোন করিমুননেসা ও রোকেয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। করিমুননেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রোকেয়া তাঁর রচিত ‘মতিচূর’ দ্বিতীয় খণ্ড করিমুননেসাকে উপসর্গ করেছিলেন। উপসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ‘আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই দ্বৈতের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙালী পড়ার খোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙালী পড়ার অনুকূলে ছিলে।’ নানা বাধা এড়িয়ে রোকেয়া আপন সাধনায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন অসাধারণ নারী।

১৮৯৮ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘নবপ্রভা’ পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা ‘পিপাসা’। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা ‘সুলতানাজ জিম’ মাস্তাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচ জন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রোকেয়া বাড়ালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেন নি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী কর্মী। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে।

১৯১৫ সালে তিনি ‘আজুমায়ে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুঃস্থ নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি : ‘মতিচূর’ ১ম খণ্ড (১৯০৪), ‘সুলতানাজ জিম’ (১৯০৮), ‘মতিচূর’ ২য় খণ্ড (১৯২২), ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) ও ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাড়ালি সমাজের তিনি শ্রদ্ধেয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক. মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই. নিজের রচনায় নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

শর্দার্থ ও টীকা

প্রকৃত	-	প্রচুর।
অসম্পত্তি	-	জমিজমা।
সামাজিক প্রতিষ্ঠা	-	সমাজে গৌরবময় অবস্থান। সমাজে গণ্যমান্য হওয়া।
শোচনীয়	-	খুব দুঃখজনক।
প্রবল	-	প্রচণ্ড, তীব্র।
অগ্রহ	-	ইচ্ছা।
অনুপ্রেরণা	-	উৎসাহ, কোনো বিষয়ে কারও মধ্যে ইচ্ছা জাগানো।
খণ্ড	-	ভাগ, অংশ।

বর্ণপরিচয়	-	বাংলাভাষা শেখা শুরু করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বই।
বাঙ্গালা	-	বাংলা। ‘বাংলা’ বোঝাতে বাঙ্গালা শব্দটি একসময় ব্যবহার করা হতো। ‘বাঙ্গালা’ শব্দটিই ‘বাংলা’য় পরিণত হয়েছে।
অনুকূলে	-	পক্ষে।
নিরলস	-	যার অলসতা বা কুঁড়েমি নেই।
স্বাবলম্বী	-	স্ব — নিজ। যে নিজেই নিজের অবলম্বন।
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন	-	দূরদৃষ্টি — দূরকে দেখার দৃষ্টি। এখানে দূর বলতে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হয়েছে।
বিশ্ব	-	বিশ বা কুড়ি।
অগ্রদূত	-	পথপ্রদর্শক।

পার্শ্বের উদ্দেশ্য

নারীর কর্মজগতের প্রতি প্রত্যাশা জ্ঞাপন করা।

পার্শ্ব-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশের নারী-আন্দোলনের অগ্রদূত। বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন এদেশের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তখন তিনি প্রায় একক চেঁচায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল কলম — লেখালেখি। একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও অনেক প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তাঁকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এই পটভূমিতেই তিনি তাঁর লেখালেখির জগৎকে যৌক্তিক ও শাবিত করে তোলেন। ফলে অনিবার্যভাবেই নারীশিক্ষার আন্দোলনে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস লক্ষীপুর জেলা। সেলিনা হোসেনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘জলোচ্ছ্বাস’, ‘হাতির নদী গ্রেনেড’, ‘ময়ূ চৈতন্যে শিশু’, ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’, ‘মুক্তিযুদ্ধের গল্প’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. শিক্ষার্থীরা তার দেখা একজন নারীর (মা, বোন, শিক্ষিকা প্রমুখ) কর্মজগৎ নিয়ে রচনা লিখবে (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছুদটি কতজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে ?

- | | |
|--------|---------|
| ক. তিন | খ. পাঁচ |
| গ. সাত | ঘ. নয় |

২. বেগম রোকেয়ার সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল —

- i. অনগ্রসর
- ii. পশ্চাৎপদ
- iii. স্বাভাবিক

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আমেনার। বাড়ির সবার আপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি অগ্রহী আমেনাকে তার স্বত্তর ছুলে ভর্তি করে দেন। স্বত্তরের সহযোগিতায় লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হন আমেনা। এরপর গ্রামের অন্য মেয়েদেরকেও শিক্ষিত হয়ে কাজ করতে অগ্রহী করে তোলেন।

৩. আমেনার স্বত্তরের সঙ্গে ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?

- ক. ইব্রাহীম সাবেরের
- খ. জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের
- গ. সাখাওয়াত হোসেন
- ঘ. করিমুল্লাসার

৪. বেগম রোকেয়া এবং আমেনার মূল লক্ষ্য ছিল, নারী সমাজের —

- i. স্বাবলম্বন
- ii. শিক্ষা
- iii. সাহিত্য রচনা

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শরীফা ও নীলা দুজনেই মানব সেবায় নিয়োজিত। শরীফা খুঁজে খুঁজে অসহায় মেয়েদের কুরে ভর্তি করিয়ে দেন। শত বাধা এলেও এ বিষয়ে তিনি আপোস করেন নি। অন্যদিকে নীলা উদ্ভাষিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে, রোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেন।

- ক. বেগম রোকেয়া কার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন?
- খ. বেগম রোকেয়ার সময়ে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? বুঝিয়ে লেখ।
- গ. শরীফার কাজে বেগম রোকেয়ার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মানব সেবার ক্ষেত্রে নীলা ও বেগম রোকেয়ার ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর।

সেই ছেলোট মায়নুর রশীদ



১ম দৃশ্য :

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই পান পাইতে পাইতে কুলে যাচ্ছে। বেশ তাড়া তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পায়ে। সাবু ফিরে আসে।)

সাবু - কী হলো আবার?

আরজু - আমি যে আর হাঁটতে পারছি না।

সাবু - রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।

আরজু - ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এতুনি যাব।

সাবু - ধাক ভাহলে।

(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়াল।)

আইসক্রিমওয়াল - আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?

আরজু - কিছু না।

আইসক্রিমওয়াল - কুলে যাবে না?

আরজু - না।

- আইসক্রিমওয়াল — কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।
- আরজু — ভাই শোন — তুমি কোন দিকে যাচ্ছে?
- আইসক্রিমওয়াল — আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।
- আরজু — আজ কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময় —
- আইসক্রিমওয়াল — ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম (আইসক্রিমওয়াল চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)
- আরজু — ভাই শোনো।
- হাওয়াই মিঠাইওয়াল — শুধু শুধু ভাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।
- আরজু — তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।
- হাওয়াই মিঠাইওয়াল — হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা — তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই — চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।
- আরজু — এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে কুলে ফাঁকি দেয়ার মতলব — কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য :

(টিকিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরো ছেলে-মেয়েরা টিকিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার — এই সাবু, এদিকে শোন — আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?
- সাবু — স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।
- লতিফ স্যার — কিন্তু কেন করে?
- সাবু — এমনিই।
- লতিফ স্যার — এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?
- সাবু — জানি না স্যার।
- লতিফ স্যার — আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই কুল কামাই করছে?
- সোমেন — স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?
- লতিফ স্যার — কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।
- মিঠু — স্যার ঐ ছেলটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
- লতিফ স্যার — কোথায়?
- মিঠু — ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।

- লতিফ স্যার — নানা কথা? তাহলে স্কুলে এলো না কেন?
- মিঠু — একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না — এখন বাজারে যাব। তারপর টিকিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলের দিকে যাব।
- লতিফ স্যার — তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আজ্ঞা ঐ আমবাগানে কি এখনো আছে?
- সোমেন — মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
- লতিফ স্যার — তোমরা চলো তো —
- সাবু — স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা)। হাওয়ারি মিঠাইওয়ালার হৈকে চলছে — হাওয়ারি মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওয়ানা দেন।)

ওয় দৃশ্য :

(আমবাগান। অসহায় আরজু বলে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

- আরজু — পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না। তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছে? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব — তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোট পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছে না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না — চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না — শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কানতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার — আরজু, তুমি কান্দছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাও নি কেন?
- সোমেন — কান্দিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কান্দছেই)
- লতিফ স্যার — কোনো ভয় নেই, বল।
- আরজু — স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
- লতিফ স্যার — তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
- আরজু — বশেছি — বাবা বলেন হাঁটা-হাঁট করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
- লতিফ স্যার — তোমার পা দুটো দেখি — এ তো রোগ, তোমার পা ঠিকন হয়ে গেছে।
- আরজু — মা জানে, সেই ছোটবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা ঠিকন — মা বোঝে কিন্তু কান্দে শুধু।
- লতিফ স্যার — তোমরা খেয়াল কর নি?
- সোমেন — না স্যার।
- লতিফ স্যার — তোমাদের বন্ধু না?
- সোমেন — জী স্যার।
- লতিফ স্যার — তোমার যদি এরকম হতো?
- সোমেন — আমরা বুঝতে পারি নি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)
- লতিফ স্যার — বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?

আরজু	-	ছুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু ছুলে যায়।)
লতিফ স্যার	-	চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দার্থ ও টীকা

সেই ছেলেটি	-	'সেই ছেলেটি' নামক এই লেখাটি একটি নাটিকা। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো মঞ্চে অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়। এ ধরনের লেখা বড় পরিসরে থাকলে তাকে বলে নাটক।
দৃশ্য	-	নাটক বা নাটিকায় বিষয়গুলোকে ঘটনাছল অনুসারে ভাগ করে নেয়া হয়। এক-একটি ঘটনাছলকে 'দৃশ্য' বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটিকার তিনটি ঘটনাছলকে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১ম দৃশ্য — গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য — সাবু, আরজুদের স্থল। ৩য় দৃশ্য — আমবাগান।
মতলব	-	উদ্দেশ্য বা ফন্দি।

পার্ঠের-উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

পার্ঠ-পরিচিতি

নাট্যিকার মামুনের রশীদ রচিত 'সেই ছেলেটি' একটি নাটিকা। এ নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিন বন্ধু একই ছুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনও কখনও বসে পড়ে। বন্ধুরা আরজুর জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটে। তাতে ছুলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বকুনি খায়। আসলে হয়েছিল কি, আরজু ছোটবেলায় ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানান আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।

একদিন ছুলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে, আরজু বন্ধুদের ছুলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওয়ালা আসে, হাওরাই মিঠাইওয়ালা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে। তারা চলে যায়। আরজু তাতে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে ছুলে দিয়ে যেত।

এদিকে শিক্ষক লতিফ স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খোঁজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে আরজুর পা অবশ হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লতিফ স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু ছুলে যায়।

লেখক-পরিচিতি

মামুনের রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'গিনিপিপ', ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্র্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র‍্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
২. নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেই ছেলেটি নাটিকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?

ক. দুইটি	খ. তিনটি
গ. চারটি	ঘ. পাঁচটি
২. আরজু তার বন্ধুদের সাথে জুলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?

ক. সে জুলে যেতে চায় না	খ. স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে
গ. তাঁর জুলা ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল য.	রোপের কারণে সে হাঁটতে পারে না
৩. 'মা বাথো কিন্তু কাঁদে' কারণ -

ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে	
খ. ছেলের পা একদিন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে	
গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না	
ঘ. ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়	

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু- দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের ঝাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

৪. রেবেকা কোন ধরনের শিশু?

ক. স্বাভাবিক	খ. পুষ্টিহীন
গ. সুবিধাবঞ্চিত	ঘ. বুদ্ধিহীন
৪. সেই ছেলেটি নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন-
 - i. মাতা পিতার সহানুভূতি
 - ii. সমাজের সহানুভূতি
 - iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা

কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে হুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে — স্যার, রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন-আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে ঝুড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন- স্যার, রওশনের দ্বায় রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাঝকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।
 ক. মিঠু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?
 খ. আইসক্রিমওয়ালার আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? বুঝিয়ে লেখ।
 গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিক স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

এ. কে. শেরাম

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। তেমনি দেশের প্রধান ও রক্তভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং এসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিভিন্ন সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচয়ে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্সবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়।

বাংলাদেশে যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, শ্রো, রাখাইন, হাজং, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, কোচ, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওরাও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

চাকমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। তারা আর্ঘ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা 'মুতি' ও মহিলারা 'সিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তাঁতে তৈরি 'সিন্দুম' (জামা) পরে। মেয়েরা 'খাদি'কে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রতিবার চুয়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজ্ঞ উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন 'ফুলবিজ্ঞ' ও 'মূলবিজ্ঞ' এবং পহেলা বৈশাখকে 'গর্যাপার্বা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে 'জুমনাচ' ও 'বিজ্ঞানাচ' বেশ জনপ্রিয়।

গারো

গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রীয়। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর জীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সম্ভান-সম্ভন্তিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোড়ে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি পূজা।

গারোরা প্রধানত কৃষিজীবী। পাহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমভলজুমির গারোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গারোরা জন্ম থেকে মুক্ত্য অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংস্কৃতিতে গীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। ‘গরানপালা’ গারোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

যারমা

মহােশীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত যারমাসের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাপড়াছড়িতে। যারমা ভাষাও মহােশীয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। যারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিয়ের সময় ধর্মীয় ও লোকচার মিলিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের গোঁয়ে বিবাহকে যারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। যারমারা শিষ্টাচারিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা স্বস্তরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। যারমাসের সামাজিক শাসনব্যবস্থার রাজা প্রধান। যারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্ভর করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও যারমারা এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো নববর্ষে সাংখাই দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত সাংখাই উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

মণিপুরি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরি জাতি অন্যতম। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মণিপুরিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলে পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে দেবমন্দির ও হাওপ। ঐ মন্দির ও হাওপকে বিয়েই আর্ভিত হয় ঐ পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাড়া বা গ্রাম ও ‘পানচাম’ বা পঞ্চায়তের জুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র : নৃত্যরত মণিপুরি

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিপুরিদের প্রাচীন ধর্মের নাম ‘আগোকাশা’। তবে মণিপুরিদের অধিকাংশই এখন সনাতন ধর্মের চৈতন্যমতের অনুসারী। মণিপুরিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, রথযাত্রা ইত্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষে রাসনৃত্য ও মেশার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিজীবী। ভাত, মাছ, শাক-সবজি মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য। মণিপুরি পুরুষেরা সাধারণত মুক্তি, গামছা, জামা ইত্যাদি পরিধান করে। আর মেয়েরা গরে নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক।

ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, ব্রাহ্মণাঙ্গী, কাছাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বুড়ার কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম ‘ককবরক’। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থা শিত্তান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ত্রিপুরার বর্তমানে সাধারণভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোকজ ধর্মের নানা সেব-সেবীর পূজা অর্চনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে।

ত্রিপুরা মেয়েরা কাপড় বরনে খুবই লক্ষ্য। তারা নিজেদের পরনের কাপড় নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। পুরুষেরা পরিধান করে নিজেদের তৈরি গামছা ও মুক্তি। ত্রিপুরার কৃষিজীবী। তারা পাখড়ে ছদ্ম ঢাখ করে। ত্রিপুরাদের সঙ্গীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সঙ্গীতের প্রচলন যেমন আছে, তেমনি আছে নানা প্রকারের নৃত্যও। ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা কৈসুম্ব, মারমাসের ‘সাক্সাই’ ও চাকমাসের ‘বিছু’ উৎসবের প্রথম অক্ষর মিলে ‘বৈসাকি’ উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় উৎসব।

সাঁওতাল

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সোক প্রধানত উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের চা বাগানে বসবাস করে। তাদের ভাষা অগ্রিক পরিবারের। সাঁওতাল সমাজ শিত্তান্ত্রিক। সম্পত্তির মালিকানাধীন এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষই প্রধান। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। পেশার দিক থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত— কৃষক ও শ্রমিক। অনেকের অন্তরে কৃষি যেমন প্রধান জীবিকা তেমনি অনেকে আবার শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ করে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ ও ‘নাচোল কৃষক বিদ্রোহ’ ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।



চিত্র : সাঁওতাল নৃত্য

সাঁওতালরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িঘর লেপে মুছে পরিষ্কার রাখা হয় এবং দেয়ালে নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়। ‘সোহরাই’ হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এটা অনেকটা পৌষ-পার্বণের মতো। সাঁওতাল নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। তাদের সুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের এইসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে — বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের বিরাট অবদান। তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	—	বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। এ সকল জাতিসত্তার এক-একটিকে বলা হয়েছে ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’। যেমন : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।
সংস্কৃতি	—	বাকি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।
আর্থভাষা	—	ইউরোপে প্রথম উদ্ভব ঘটেছে এমন একটি প্রদান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্থ ভাষা। এই আর্থ ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতির ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
পিতৃতান্ত্রিক		
পরিবার	—	মানব সমাজে দু’রকমের পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে: (ক) পিতৃতান্ত্রিক, (খ) মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সে রকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রথায় উক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তবে একালে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।
খাদি	—	হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
লৌকিক আচার	—	অনুষ্ঠান-স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রুচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।
মাতৃস্বীয় পরিবার	—	কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিত হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃস্বীয় পরিবার বলে। যেমন : গারো পরিবার।
পদবি	—	উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বংশ পরিচয় দেয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।

জুম	—	পাহাড় চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি।
মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠী	—	একটি ভাষাগোষ্ঠী; এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।
মণ্ডপ	—	পূজা বা সভা-সমিতির জন্য ছাদযুক্ত চত্বর।
বয়ন	—	বোনা।

পার্শ্ব উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরো অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। ক্ষুদ্র এই জাতিসত্তার মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সর্বাঙ্গিক এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘বসন্ত ফুলি পালগী লৈরাং’, ‘মণিপুরি কবিতা’, ‘চৈতন্যে অধিবাস’, ‘মনিদীপ্ত মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. সাংখ্যাই | খ. বিজু |
| গ. বৈসুখ | ঘ. সোহরাই |

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা-

- i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
- ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. iii ও i | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি ছুলে ভর্তি হয়। সেখানে লুসি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে 'দাড়িং' লুসির মায়ের পদবী। শুনে তার কাছে অল্পত্ব লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্তা রচনার কোন জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ?

- | | |
|----------|------------|
| ক. চাকমা | খ. মারমা |
| গ. গারো | ঘ. সাঁওতাল |

৪. উদ্দীপকের জাতি সত্তা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের-

- i. সংস্কৃতির ধারক
- ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
- iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাহি উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধুতি ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি 'সিলুম' পরে। মেয়েরা খাদিকে গুড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?

খ. পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার কোন জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নতুন দেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের তেউয়ে নাচে ।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো, কোথায়
চলে উড়িয়ার টানে ।
জানি না কোন দেশে
পৌছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে ।



থাকি খরের কোশে,
সাখ জাগে মোর মনে,
অমনি করে যাই ভেসে, তাই,
নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে,
জলের ধারে ধারে,

নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

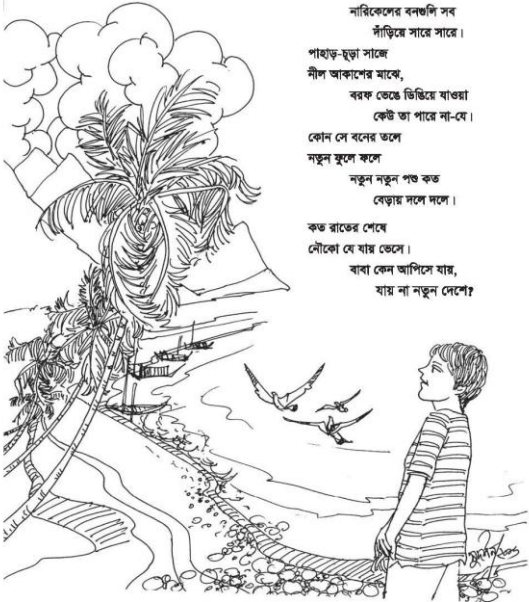
পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ভিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না-যে।

কোন সে বনের তলে
নতুন ফুলে কলে

নতুন নতুন গুপ্ত কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নৌকো যে যায় ভেসে।

বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?



শব্দার্থ ও টীকা

- উঁটা — চাঁদ ও সূর্যের শক্তির আকর্ষণে সমুদ্র বা নদীতে বেড়ে ওঠা জলের কমে যাওয়ায় বলা হয় উঁটা।
- অপিস — অফিস শব্দের একটি কথ্য রূপ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। উঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার কোন ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌঁছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল জাগবে যে কারোরই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য বা অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যকুলতা শিশুরা তার আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যে যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা। খ্রীনিবেশন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি গ্রন্থে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত কর।
- তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।
- সর্বশেষ তুমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখ।

নতুন প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

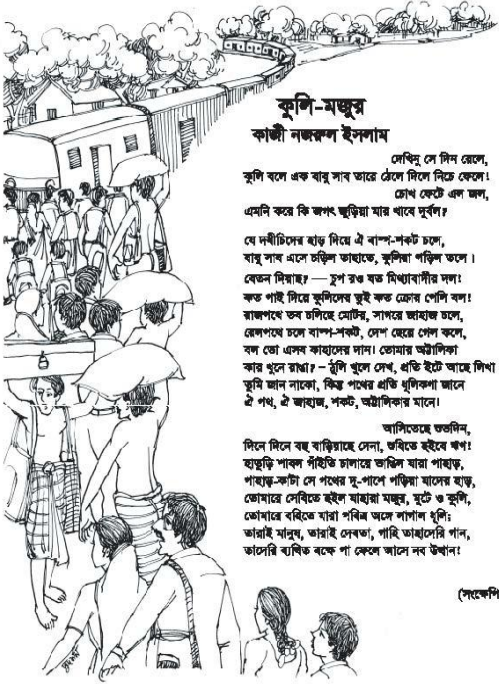
১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে ?
ক. নতুন নগর খ. পাহাড় চূড়া
গ. নারকেল বন ঘ. নতুন পত
 ২. “অমনি করে যাই ভেসে, তাই / নতুন নগর বনে।”
—এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে ?
i. অসীম সৌন্দর্য
ii. অজানা আনন্দ
iii. অপার বিশ্ব
- কোনটি সঠিক ?
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
 ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
 একটি ধানের শীষের উপরে
 একটি শিশির বিন্দু।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ?
ক. সীমাহীন কৌতূহল
খ. প্রকৃতির রহস্য
গ. অজানাকে জানা
ঘ. অপার আকাঙ্ক্ষা
৪. উক্ত দিকটি ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে ?
ক. জমি না কোন্ দেশে / পৌঁছে যাব শেষে
খ. থাকি ঘরের কোণে / সাথ জাগে মোর মনে
গ. পাহাড়-চূড়া সাজে / নীল আকাশের মাঝে
ঘ. দূর সাগরের পারে / জলের ধারে ধারে

সুজনশীল প্রশ্ন

১. শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে হৃদিতা বেড়াতে যায় সেটমার্টিন ঘীশে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা ওর মনে কৌতূহল জাগায়। দিশন্ত বিজুত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ ওকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে — আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।
ক. নীল আকাশের মাঝে কী সাজে?
খ. ‘থাকি ঘরের কোণে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. হৃদিতার সেটমার্টিনে দেখা দৃশ্যে ‘নতুন দেশ’ কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘নতুন দেশ’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।” — উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



কুলি-মজুর কাজী নজরুল ইসলাম

দেখি সে দিন রেল,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে কেনে!
চোখ কেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ ছুড়িয়া যার বাবে দুর্বল?

যে দবাচিসের হাড় দিয়ে ঐ বাম্প-শকট চলে,
বাবু সাব এনে ঢঙিল ভাছাতে, কুলিয়া পড়িল তলে।
বেতন মিয়াছ? — হুশ হও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিসেব তুই কত ফোর পেলি বল!
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাপরে জাহাজ তলে,
রেলপথে চলে বাম্প-শকট, দেশ ছেড়ে গেল কলে,
বল তো এসব কাহাসের দান! তোমার অট্টালিকা
কর খুনে রাঙা? — হুঁসি খুলে সেব, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো, কি পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে তত্ত্বদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে সেনা, তথিতে হইবে ঋণ!
হাফুড়ি পাকল পঁহিতি চালায়ে তছিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাসের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, দুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবির জনে লাগাল হুঁসি;
ভারাই মানুষ, ভারাই সেবতা, পাই তাহাদেরি দান,
তাদেরি ব্যতিক বকে পা কেনে আসে নব উদ্যান!

(সংক্ষেপিত)

শদ্যর্থ ও টীকা

দযীচি	-	ভারতীয় পুরাণে উল্লিখিত একজন ত্যাগী যুনি । এ কবিতায় শ্রমজীবী কুলি-মজুরদের দযীচিযুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । যে শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার বিস্তারে শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাই আজ অবহেলিত । তাদের শ্রমের ওপর ভর করে যারা ধনী হয়েছেন, তাঁরাই সকল সুবিধাভোগী । কবি দুঃখ করে ত্যাগী দযীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন ।
বাম্প-শকট	-	‘শকট’ মানে গাড়ি । বাম্প-শকট হচ্ছে বাম্প দ্বারা চালিত গাড়ি । এখানে রেলগাড়ি ।
পাই	-	মুদ্রার একক বিশেষ । এ কবিতায় ‘পাই’ বলতে কুলি-মজুরদের মজুরির ‘খল্পতা’ বোঝানো হয়েছে ।
ক্রোর	-	কোটি ।
ঠুলি	-	চোখের ওপর ঢাকনি । গুরুত্ব যখন ঘানিতে জোড়া হতো, তখন তার চোখে ঢাকনি পরানো হতো । ঐ ঢাকনির নাম ‘ঠুলি’ । ‘ঠুলি খুলে’ মানে সচেতন হয়ে ।
অট্টালিকা	-	প্রাসাদ, অন্য কথায় সুউচ্চ দালান বা ইমারত ।
‘দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে সেনা’	-	অতীতকাল থেকে মানব সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষদের অবদানে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রতিনানে তাঁরা পেয়েছেন অল্পই ।
শাবল	-	লোহার তৈরি মাটি বোড়ার হাতিয়ার ।
গঁইতি	-	পাথর, ইট প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কঠিন স্থান বোড়ার জন্য লাঙ্গলের আকারের দুমুখো কুড়াল ।
বকে	-	বুকে ।
নব উত্থান	-	কোনো ভালো কাজের জন্য নতুন করে উদ্যোগী হওয়া ।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা ।

পাঠ-পরিসিতি

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত । ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন ।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা । এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোটির, জাহাজ, রেলগাড়ি চলেছে । গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা । এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি হয়েছে বিত্ত-সম্পদের মালিক । কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এই কুলি-মজুররাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত । এক শ্রেণির হুদয়হীন স্বার্থাঙ্ক মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিত্ত-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ ।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কৃপমত্নক ‘অসংযমীর’ আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

৩. কবিতাংশের ক্ষুদ্রমনা’ কুলি-মজুর কবিতায় বর্ণিত কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে ?

- | | |
|---------------|------------------|
| ক. বাবুসাবদের | খ. মিথ্যাবাদীদের |
| গ. দম্পতিদের | ঘ. কুলি-মজুরদের |

৪. কবিতাংশের মূলভাব ‘কুলি-মজুর কবিতার নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে ?

- ক. দিনে দিনে বাড়িয়াছে সেনা, শুধিতে হইবে ঋণ
খ. তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
গ. তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান
ঘ. তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগলে ধূলি

সুজনশীল প্রশ্ন

১। চেরারম্যান আজমল সাহেবের এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিন্তু তার ছেলে কারণে-অকারণে বাড়ির কাজের পোক, আশে-পাশের বেটে ঝাওয়া মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। চেরারম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদের আজ তুচ্ছ জ্ঞান করছ — সত্যিকার অর্থে তারাই আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা, তাদের কারণেই আমরা সুন্দর জীবন যাপন করছি।

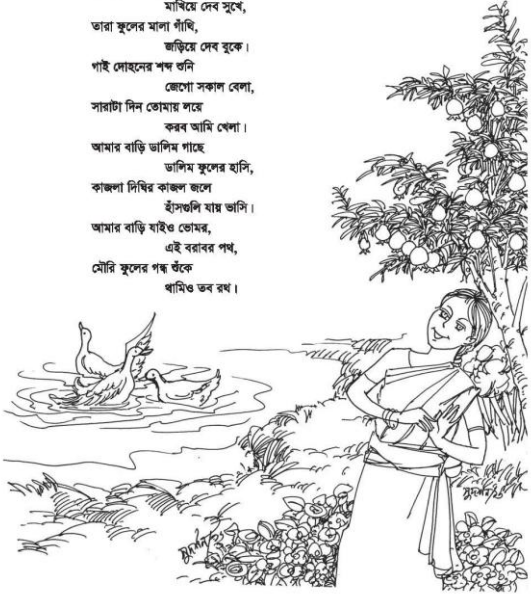
- ক. ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় রেলপথে কোনটি চলে?
খ. ‘শুধিতে হইবে ঋণ’ — কথাটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. চেরারম্যান সাহেবের ছেলের আচরণে ‘কুলি-মজুর’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘চেরারম্যান সাহেবের মনোভাব ‘কুলি-মজুর’ কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন’ — বিশ্লেষণ কর।’



আমার বাড়ি জসীম উদ্দীন

আমার বাড়ি বাইও ভোমর,
বসতে দেব গিড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিড়ে।
শালি ধানের চিড়ে দেব,
বিল্লি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা,
গামছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুরো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাত।

চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
 মাথিয়ে দেব সুখে,
 তারা ফুলের মালা গাঁথি,
 জড়িয়ে দেব বুকে ।
 পাই দোহনের শব্দ তনি
 জেগো সকাল বেলা,
 সারাটা দিন তোমায় লরে
 করব আমি খেলা ।
 আমার বাড়ি ডালিম গাছে
 ডালিম ফুলের হাসি,
 কাজলা দিঘির কাজল জলে
 হাঁসতলি যায় ভাসি ।
 আমার বাড়ি হাইও ভোমর,
 এই বরাবর পথ,
 মৌরি ফুলের গন্ধ তঁকে
 ধামিও তব রথ ।



শব্দার্থ ও টীকা

- ভোমর — মৌমাছি। ভ্রমরের কথ্য রূপ ভোমর। কবিতাটিতে কোনো বস্তু বা শ্রিয়জনকে ভোমর বলে
 সুখোখন করে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
- শালি ধান — এক প্রকার আমন ধান, যা হেমন্তকালে উৎপন্ন হয়।

কবিতাংশটি পড়ে ও ও নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই —
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই

কড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের মধুর রসে
রঙিন করি মুখ।

৩. উদ্ধৃতির প্রথম স্তবকের সাথে নিচের কোন চরণ/ চরণসমূহে মিল লক্ষ করা যায়-

- i. আমার বাড়ি যাইও ভোমর / বসতে দেব পিড়ে।
- ii. গাছের পাতা দুলিয়ে বাতাস / করব সারা রাত্রি।
- iii. তারা ফুলের মালা পাখি / জড়িয়ে দেব বুকে।

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার মিল কোথায় ?

- | | |
|-------------------|---------------|
| ক. প্রকৃতিতে | খ. নিমন্ত্রণে |
| গ. খাদ্য-বর্ণনায় | ঘ. বন্ধুত্বে |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. তুমি যাবে ভাই — যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর দেহখানি রহিয়াছে ডরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের স্নেহের ছায়।

- ক. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কাজলা দীখির কাজল জলে কী হাসে?
- খ. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার কোন অংশের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপক ও 'আমার বাড়ি' কবিতার অর্থার্থ কি এক? বিশ্লেষণ কর।



শোন একটি মুজিবরের থেকে

গৌরীশসন্ন মজুমদার

শোন একটি মুজিবরের থেকে

লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেট্রোপথে

আবার যে যাব ফিরে, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
শিল্পে-কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার ধনি।।

বিশ্বকবির 'সোনার বাংলা'

নজরুলের 'বাংলাদেশ'

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'

রূপের যে তার নেই কো শেব, বাংলাদেশ।

'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার

এখনো কেন ডাব, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
অন্ধকারে পূব আকাশে
উঠবে আবার দিনমণি।।

শব্দার্থ ও টীকা

- 'একটি মুজিব' — 'একজন মুজিব'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির আশা-ভরসার একক আধারস্থল।
- 'লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি' — একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর বঙ্ককণ্ঠে স্বাধীনতা আহ্বানের মধ্য দিয়ে যেন লক্ষ বাঙালির মিলিত কণ্ঠস্বর স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল।
- 'হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব' — একসময় এই বাংলা ছিল স্বাধীন জনপদ। ১৭৫৭ সালে তা বৃটিশদের কাছে স্বাধীনতা হারায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে এই দেশ - পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হলে বিভক্ত পূর্ববাংলা পরিচিতি পায় পূর্ব পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের চাপিয়ে দেয়া দুঃশাসনে বাঙালি একে একে হারাতে বসে সব অধিকার। মহান মুক্তিযুদ্ধে কাল্পিত

বিজয়ের মাধ্যমে সেই হারানো স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বকবি

‘সোনার বাংলা’ — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত একটি দেশাত্মবোধক গানে এই দেশকে ‘সোনার বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন – যা আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত।

নজরুলের

‘বাংলাদেশ’ — ‘বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রথম কবিতাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তাঁর কবিতা, সংগীত ও প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের উদীপনামূলক লেখাগুলো ছিল আমাদের অন্তরীণ প্রেরণার উৎস।

জীবনানন্দের

‘রূপসী বাংলা’ — নিসর্গের কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপ সৌন্দর্য চিরায়ত মহিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে।

‘জয় বাংলা

বলেতে.....ভাব’ — পাকিস্তান বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানেই প্রকম্পিত হতো সারা দেশ। জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী জেনে দ্বিধাহীন চিত্তে এই একটি শ্লোগানেই সংযুক্ত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর্তেই পৌরীশ্রঙ্গ মজুমদারের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গানটি অন্যান্য গানের সাথে বারবার বাজানো হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। গানটির সুরকার ও শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী অংশুমান রায়। অসামান্য জনপ্রিয় হওয়ার পর পৌরীশ্রঙ্গ নিজেই এই গানটিকে ‘The voice of not one, but million mujibors singing’ শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন যা, গেয়েছিলেন শিল্পী কবরী নাথ।

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চের কালরাতে এই দেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালি জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞের সূচনা করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপরই তাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর আগে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’। তাঁর বক্তৃকণ্ঠের আহ্বান ঐ মুহূর্তেই সমগ্র বাংলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর স্বাধীনতার ডাক কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে বেজেছে চারদিকে। পাকিস্তান-বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে সারা দেশেই প্রচার করা হতো তাঁর ভাষণ-বক্তৃতা। মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের রক্ত-চেতনায় তা প্রণোদনা জাগাতো।

৪. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের কারণ, তিনি-

- i. বাঙালির জাতির পিতা
- ii. স্বাধীনতার স্বপ্ন-দিশারী
- iii. বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মুজিবুর রহমান

ওই নামে যেন বিস্মিত্যাসের অগ্নি-উগারী বাণ।

বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে

জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালালল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে।

মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,

তব সম্মুখে পথে পথে আজ সেখানে চলিছে আলা।

ক. কোন কবির চোখে বাংলাদেশ 'রূপসী বাংলা'?

খ. 'অন্ধকারে পূর্ব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ২য় চরণে 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' কবিতার সম্পূর্ণভাবে বহন করে কি? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সবার আমি ছাত্র সুনির্মল বসু

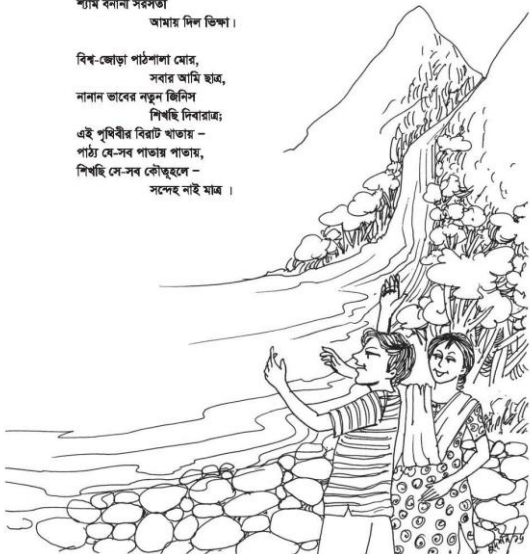
আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে তাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বান্ধুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন তাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে -
দিল-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন ভেঙ্গে ফুলতে,
ঠান শিখালো হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইন্দ্রিতে তার শিখায় সাগর -
অস্তুর হোক রক্ত-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।



মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
 পেলাম আমি শিক্ষা,
 আপন কাজে কঠোর হতে
 পাখাখ দিল দীক্ষা ।
 ঝরনা তাহার সহজ গানে
 গান জাগালো আমার গ্রামে,
 শ্যাম বনানী সরসতা
 আমার দিল ভিক্ষা ।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
 সবার আমি ছাত্র,
 নানান ভাবের নতুন জিনিস
 শিখছি দিবারাত্র;
 এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় –
 পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,
 শিখছি সে-সব কৌতুহলে –
 সন্দেহ নাই মাত্র ।



শব্দার্থ ও টীকা

দিল-খোলা	—	মনখোলা, মুক্তমন।
মন্ত্রণা	—	উপদেশ, যুক্তি-পরামর্শ, প্রেরণা।
সহিষ্ণুতা	—	সহ্য করার ক্ষমতা।
পাখাণ	—	পাখর।
শ্যাম বনানী	—	সবুজ বন।
মৌন-মহান	—	ধৈর্যে-ইচ্ছায়ে পাহাড়ের মতো মৌন বা নীরব এবং গুণে-কর্মে পাহাড়ের মত সুউচ্চ বা মহান হবার কথা বলা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীকে সততা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

জন্মগতভাবেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানবিক ও নৈতিক শিক্ষালাভেও প্রকৃতি সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আকাশের অসীমতা আমাদের উদারতা শেখায়। আমাদের কর্মপ্রেরণার বড় উৎস নিরন্তর বায়ু-এবাহ। পাহাড়ের উচ্চতা আমাদের উদারতা শেখায় উৎসাহ জোগায়। আহুত্যাগের আরেকটি বড় উদাহরণ সূর্য। সে তার নিজের আলো দিয়ে সবাইকে আলোকিত করে। সাগর তার বুকে হুগু হুগু ধরে বিশাল রত্নভাণ্ডার সংরক্ষণ করে নীরবে মানবকল্যাণ করে যায়। নদী আমাদের গতিশীল থাকার শিক্ষা দেয়। গতিময় ঝরনা মনকে ভেতর থেকে চলমান রাখতে সাহায্য করে। সবুজ বন আমাদের মনকে রাখে সজীব। মাটি নিজে যেমন সব কিছু সহ্য করতে পারে, তেমনি অন্যদেরও সে সহিষ্ণুতা শিখায়। নিজের সব কাজে দৃঢ় থাকার পাখরের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। এভাবে পৃথিবীর সকল বস্তু বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।

কবি পরিচিতি

সুনির্মল বসু ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুরে। তিনি ছিলেন কবি ও শিশুসাহিত্যিক। কবিতা, গল্প কাহিনি, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে শিশু ও কিশোর উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ‘হানাবড়া’, ‘বেড়ে মজা’, ‘হেঁচো’, ‘হলদুল’, ‘কথা শেবা’, ‘পাততাড়ি’ ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। [দলগত কাজ]
- খ. মানুষের জন্য কল্যাণকর গুণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- গ. তোমার পরিচিত একজন সং ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কবিতায় আপন কাজে কঠোর হওয়ার শিক্ষা দেয় কোনটি ?
 ক. পাহাড় খ. পাখাণ
 গ. ঝরনা ঘ. মাটি

২. 'এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
- ক. পৃথিবীতে অজানা বলে কিছু নেই
 খ. পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলা হয়েছে
 গ. পৃথিবীর সবকিছুই জ্ঞানের আধার
 ঘ. প্রকৃতি বড় একটি খাতা বিশেষ
৩. যখন মানবকুল ধনবান হয়
 তখন তাদের শির সমুন্নত রয়
 কিন্তু কলশালী হলে এই তরুণ
 অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন
- উদ্দীপকের সাথে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার সঙ্গতিপূর্ণ চরণ –
- i. শ্যাম বনানী সরসতা
 আমার দিল ভিক্ষা
 ii. মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
 পেলাম আমি শিক্ষা
 iii. আকাশ আমার শিক্ষা দিল
 উপার হতে ভাইরে

কোনটি সঠিক ?

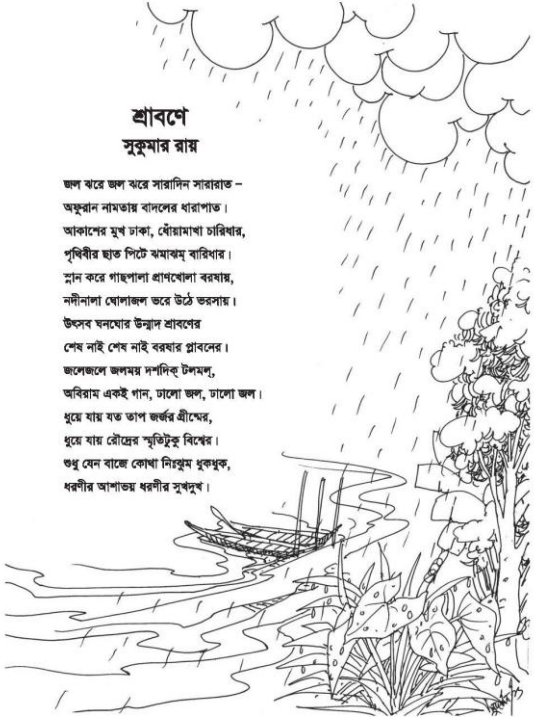
- ক. i ও ii
 গ. i ও iii
 খ. ii ও iii
 ঘ. i, ii ও iii
৪. উদ্দীপকে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কোন শিক্ষণীয় দিকটি - ফুটে উঠেছে ?
- ক. নত না হওয়া
 খ. শিক্ষা অর্জন করা
 গ. মিলে মিলে থাকা
 ঘ. উদ্ধত না হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপক ১ম অংশ : মক্তার পথে প্রান্তরে পৌরশিকের প্রস্তরখারে মহানবী আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রোপে বারবার উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; – 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'।
২. উদ্দীপক ২য় অংশ : মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) সবার আদর্শ ও অনুকরণীয়ও বটে। সাদা হাস্যজ্বল ও মিষ্টভাবী মহানবী সবার কাছে 'মাটির মানুষ'। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই যেমন কাজে গতি পেত, তেমনি সবাই তার কাছ থেকে শিখেছিল সুন্দর সুন্দর চিন্তা করতে। আর প্রয়োজনে কঠিন হতেও তিনি পিছপা হতেন না।
- ক. কোনটি আমাদেরকে 'দিল খোলা' হওয়ার শিক্ষা দেয়?
- খ. 'সবার আমি ছাত্র' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
- গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কোন অংশের পরিচয় রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ যেন মানুষের জন্য 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা'র মতই – উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

শ্রাবণে সুকুমার রায়

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত -
অফুরান নামডায় বাদলের ধারাপাত ।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোয়ামাখা চরিত্রাধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে অমাবস্য বারিধার ।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ষোড়াজল ভরে উঠে ভরসায় ।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্রাবনের ।
জলেজলে জলময় দশদিক্ টলমল,
অবিরাম একই পান, ঢালো জল, ঢালো জল ।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর ব্রীষের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের ।
ওগু যেন বাজে কোথা নিঃশ্বাস মুকমুক,
ধরণীর আশাভর ধরণীর সুখদুখ ।



শব্দার্থ ও টীকা

‘অতুরান নামতায়

বাদলের ধারাপাত’ — গণিতে ‘নামতা’ বলতে বোঝায় গুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর ‘ধারাপাত’ হল অঙ্ক শেখার প্রাথমিক বই। এ কবিতায় বৃষ্টিধারার পতনকে বলা হচ্ছে ধারাপাত; বৃষ্টির পতনের অবিরাম রিমঝিম ধ্বনি অনেকটা যেন শিতদের নামতা পড়ার শব্দের মতো।

ছাত — ছাদ। ছাদের কথ্য রূপ ছাত।

বারিধার — জলের ধারা।

উন্মাদ — উন্মত্ত, ফিষ্ট। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্মাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।

জর্জর — কাতর।

নিঃশুম — নিঃশব্দ, নীরব, নিঃশব্দ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

‘শ্রাবণে কবিতাটি’ সুকুমার রায়ের ‘খাই খাই’ ছড়ার অঙ্গভূত। গ্রীষ্মের দাবদাহে জর্জরিত প্রকৃতি অবিরাম বর্ষায় স্নান করে সজীব ও প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে, কবিতায় সে ছবিই আঁকা হয়েছে। বর্ষার জলে গাছপালা নদী-নালা থেকে শুষ্ক করে রুদ্ধ প্রকৃতি মুহূর্তেই জলে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধুয়ে মুছে প্রকৃতি এ সময় নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবেই স্বতন্ত্র পালাবদলের মতো মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের পালাবদল ঘটে।

কবি পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর আদি পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ‘আবোল তাবোল’, ‘হয়বরল’, ‘পাগলা দামু’ প্রভৃতি তার অতুলনীয় রচনা। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যজিত রায় তাঁর পুত্র। সুকুমার রায়ের কলকাতায় জন্ম ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. শ্রাবণ মাসে তোমার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে? লেখ।

খ. বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্রাবণের জল অবিরাম ধরে –

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. সঙ্গীতের মত | খ. কোলাহলের মত |
| গ. গণিতের মত | ঘ. নামতার মত |

২. 'অবিরাম একই গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. বর্ষার প্রাচীন
- খ. নদীর ঘোলাজল
- গ. একটানা বৃষ্টি
- ঘ. সঙ্গীত সন্ধ্যা

৩. বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-সদৃশ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
— উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার যে দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক. অবিরাম বৃষ্টি
- খ. মেঘলা আকাশ
- গ. বৃষ্টিপ্লাবিত প্রকৃতি
- ঘ. তাপ ধুয়ে যাওয়া

৪. 'বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে'
— উদ্দীপকের ভাবধারা 'শ্রাবণে' কবিতার কোন পর্য্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. অফুরান নামতায় বাদলের ধারাঘাত
- খ. আকাশের মুখ ঢাকা, ঘোঁয়ামাখা চারিধার
- গ. স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষার
- ঘ. নদীনালা ঘোলাজল ভরে উঠে ভরসায়

সুজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক (১) আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে— ঘোলাটে মেঘের আড়,
কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে— ছল ছল জলধারে।
কাহার খিয়ারী কদম শাখে— নিবুঝুম নিরালায়,
ছোট ছোট রেণু হুলিয়া দিয়াছে— অঙ্কুট কলিকায়।

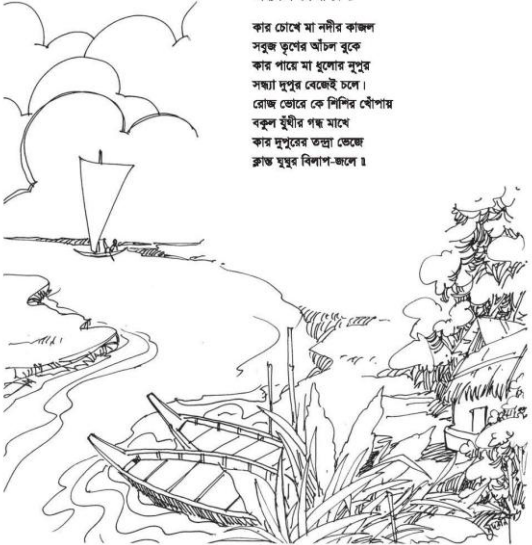
উদ্দীপক (২) কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল স্তার মায়াবী আখর টানি।

- ক. প্রাণখোলা বর্ষায় কে স্নান করে?
- খ. 'উন্মাদ শ্রাবণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. ১ম উদ্দীপকে 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ণিত বর্ষার কোন দিকটি চিত্রিত হয়েছে? বর্ণনা কর।
- ঘ. ২য় উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে কি?— যুক্তিসহ বিচার কর।

গরবিনী মা-জননী সিকান্দার আবু জাফর

ওরে আমার মা-জননী
জন্মভূমি বাঙলারে
তোর মত আর পুণ্যবতী
ভাগ্যবতী বল মা কে ৷

কার চোখে মা নদীর কাজল
সবুজ তৃণের আঁচল বুকে
কার পায়ে মা ধুলোর নুপুর
সন্ধ্যা দুপুর বেজেই চলে।
রোজ ভোরে কে শিশির ঝোঁপায়
বকুল ফুঁথীর গন্ধ মাখে
কার দুপুরের তন্দ্রা ভেঙ্গে
ক্লান্ত হৃদয় বিলাপ-জলে ৷

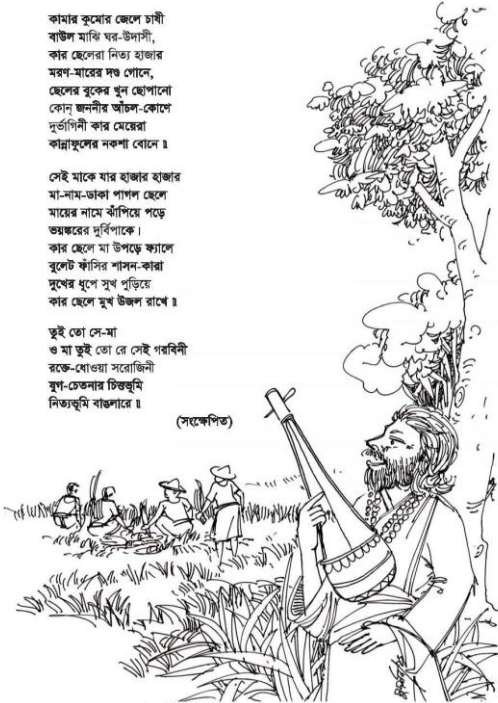


কামার কুমোর জেলে চাষী
বাউল মাঝি ঘর-উদাসী,
কার ছেলেরা নিত্য হাজার
মরণ-মারের দণ্ড গোনে,
ছেলের বুকের খুন ছোঁপানো
কোন জননীর আঁচল-কোণে
দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা
কান্নাফুলের নকশা বোনে ॥

সেই মাকে যার হাজার হাজার
মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
মায়ের নামে কাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে ।
কার ছেলে মা উপড়ে ক্যালে
বুলেট ফাঁসির শাসন-কারা
দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
কার ছেলে মুখ উজল রাখে ॥

তুই তো সে-মা
ও মা তুই তো রে সেই গরবিনী
রক্তে-ধোওয়া সরোজিনী
যুগ-চেতনার চিন্তাক্রমি
নিত্যকৃমি বাঙলারে ॥

(সংক্ষেপিত)



শব্দার্থ ও টীকা

পুণ্যবতী	— পুণ্য বা ভালো কাজ করেন এমন নারী।
সরোজিনী	— সরোজ মানে পদ্ম – সরোজের স্ত্রীবাচক রূপ সরোজিনী। এ কবিতায় দেশমাতৃকা বাংলাকে তুলনা করা হয়েছে কমলীয় পদের সঙ্গে।
‘মরণ-মারের দণ্ড’	— মরণের আঘাত থেকে প্রাপ্ত শাস্তি।
ছোপানো	— ছোপ মানে ছাপ, রঙ। এখানে ছোপানো মানে রাঙানো।
পাগল ছেলে	— বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী ও তরুণ-যুবকেরাই ‘পাগল ছেলে’ – যারা নির্ভয়ে যুদ্ধে-সম্মুখীন লিপ্ত হয়েছিল।
‘ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে’	— উত্তিকর দুর্বোণ ও দুর্ঘটনা। এখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।
শাসন-কারা	— পাকিস্তানি দুঃশাসন – যা ছিল কারাগারে সমান।
উজল	— উজ্জ্বল শব্দটির কোমল রূপ।
‘যুগ-চেতনার চিত্তভূমি / নিত্যভূমি বাঙলারে’	— যুগের আকাজকে ধারণ করা চিরন্তন দেশমাতৃকা বাংলাদেশ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে ‘দেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ’ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি ‘বাঙলা ছাড়া’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। উপর্যুক্ত কবিতাটিতে পুণ্যবতী ভাষ্যবতী দেশমাতার গর্ভিত হয়ে ওঠার কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী সন্তান এই মায়ের কোল জুড়ে থাকে। এই মাকে রক্ষা করার জন্য এই সন্তানরা শত কষ্ট সহ্য করে, তবে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে তারা মেনে নিতে পারে না। মাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করে না। আবার এই মাকেও সন্তানের জন্য বিশেষ জমিকা রাখতে হয়। সন্তানকে সাহস ও শক্তি যোগাতে হয়। দেশমাতৃকাকে সকল দুঃশাসন থেকে রক্ষার জন্য মায়ের সন্তানরা ঝুপিয়ে পড়ে। তারা যে কোনো দুঃসময়ে জেল জুলুম ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে নিজের সুখ শান্তি ও আলস্য পরিহার করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। যুগের দাবি ও সময়ের দাবি রক্ষায় যে সন্তানরা সাহসের সাথে সম্মুখীন পথ বেছে নেয়, তাদের জন্য বাংলাদেশ সত্যিই গর্ভিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটি এই সাহসী ও সম্মুখী জনতার ভিত্তিভূমি।

কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক। জন্মেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। জন্মসাল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ‘প্রসন্ন প্রহর’, ‘তিমিরান্তিক’, ‘বাঙলা ছাড়া’ প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ‘সিরাজ-উ-দৌলা’ তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলগত কাজ)

খ. পূর্ববর্তী কোন শ্রেণিতে পড়া তোমার ভাললাগা কোন ‘দেশপ্রেমের কবিতা’ সন্ধে তোমার অনুভূতি লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মায়ের আঁচল কোণে কী লেগে আছে?

ক. বকুল ফুলের গন্ধ	খ. কান্না ফুলের নকশা
গ. ছেলের বুকের খুন	ঘ. সবুজ তৃণ
২. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় 'দুর্ভাগিনী মেয়ে' বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?

ক. বাংলার অবহেলিত মেয়েদের
খ. বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের
গ. দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের
ঘ. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের
৩. আমরা অপমান সহিব না
 ভীরুর মত ঘরের কোণে রইব না
 আমরা আকাশ হতে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি
 তোমার ভয় নেই মা
 আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।
 উদ্দীপকের চেতনা নিচের যে চরণে বিদ্যমান —

ক. কার ছেলেরা নিত্য হাজার মরণ মারের দণ্ড গোণে
খ. ছেলের বুকের খুন ছোপানো কোন জননীর আঁচল কোণে
গ. মায়ের নামে কাঁপিয়ে পড়ে ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে
ঘ. দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে কার ছেলে মুখ উজল রাখে
- ৪। এক সাগরের রক্তের বিনিময়ে
 বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা
 আমরা তোমাদের জুলবনা।
 — উদ্দীপকে 'গরবিনী মা জননী' কবিতায় উল্লিখিত বাঙালি সন্তানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. সঙ্গ্রামের	খ. গর্বের
গ. প্রতিবাদের	ঘ. আত্মত্যাগের

সৃজনশীল প্রশ্ন

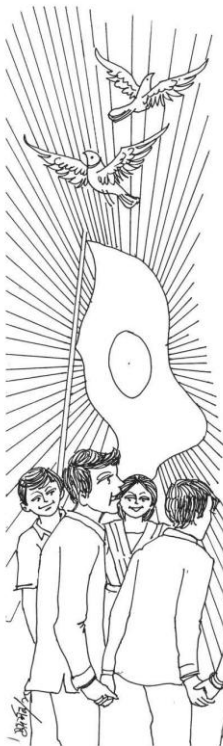
মা দিবসে রত্নগর্তী স্বীকৃত মায়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন — আমাদের মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোট, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত সালাম ‘মা’। তোমার মুখের হাসির জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ক. সন্ধ্যা দুপুর মার গায়ে কী বাজে?

খ. ‘রক্তে ধোওয়া সরেজিনী’ — বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

গ. সাজিদের মাধ্যমে ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “প্রেক্ষাগট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত” — বিশ্লেষণ কর।



সাম্য সুফিয়া কামাল

শতকের সাথে শতক হতে
মিলারে একত্রিত
সব দেশে সব কালে কালে সবে
হয়েছে সমুন্নত ।
বিপুল পৃথিবী, প্রসারিত পথ,
যাত্রীরা সেই পথে,
চলে কর্মের আবহানে কোন
অনন্ত কাল হতে
মানব জীবন। শ্রেষ্ঠ, কঠোর
কর্মে সে মহীয়ান,
সঙ্ঘর্ষে আর সাহসে প্রজ্ঞা
আলোকে দীপ্তিমান ।
পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,
সমুখে, শিক্ত জলে
বিজয় কেতন উড়ারে মানুষ
চলিয়াছে দলে দলে ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দক	—	একশত।
সমুন্নত	—	অতিশয় উঁচু।
বিপুল	—	বিশাল।
প্রসারিত	—	বিস্তার লাভ করেছে এমন।
অনন্ত	—	যার অন্ত বা শেষ নেই।
মহীয়ান	—	সুমহান।
সঙ্গ্রাম	—	লড়াই।
প্রজা	—	গভীর জ্ঞান।
দীপ্তিমান	—	উজ্জ্বল।
সিদ্ধ	—	সমুদ্র, সাগর।
কেতন	—	পতাকা।

পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

‘সাম্য’ কবিতাটি ‘নওল কিশোরের দরবারে’ গ্রন্থভুক্ত ‘মিলিত সেবা ও সাম্য ব্রীতিতে’ কবিতার অংশবিশেষ। কোন বড় কাজ কেউ একা করতে পারে না। সে জন্য দরকার হয় অনেক মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ। সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনেই ছিল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অসীম সাহস, সম্মিলিত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে। এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র – শ্রেণি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

কবি-পরিচিতি

সুকিয়া কামাল ১৯১১ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক ও নারীনেত্রী। তিনি ভাবা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ বিশেষ করে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — ‘সাঁঝের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কাঁটা’। তিনি ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলীয় কাজ)
- সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে – তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কর। (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কর্মের আহ্বানে মানুষ কত দিন হতে চলছে ?
ক. সহস্রাব্দকাল খ. অনন্তকাল
গ. শতাব্দীকাল ঘ. ঐতিহাসিক কাল
২. কালে কালে মানুষ কীভাবে সমুন্নত হয়েছে ?
ক. সম্মিলিত প্রয়াসে খ. একক প্রয়াসে
গ. সভ্যতার বিকাশে ঘ. অর্থনৈতিক বিকাশে

উদ্ধৃতাংশটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) একতাই বল
- (২) চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা

৩. উদ্ধৃতির ১ম অংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন চরণসমূহের মিল আছে ?
i. বিপুল পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে
ii. শতকের সাথে শতক হস্ত / মিলায়ে একত্রিত
iii. বিজয় কেতন উড়িয়ে মানুষ / চলিরাছে দলে দলে

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্ধৃতাংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন ভাবের মিল আছে।

- | | |
|---------------------|--------------|
| ক. সমগ্রাম | খ. প্রচেষ্টা |
| গ. সম্মিলিত অবস্থান | ঘ. সাহস |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অমিত সাহেব একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারো সহযোগিতা নিতে সম্মত নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছে।
ক. ‘সাম্য’ কবিতায় কোনটির মাধ্যমে জীবন মহীযান হয়?
খ. ‘সংগ্রামে সাহসে প্রজ্ঞা’ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে ‘সাম্য’ কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “উদ্বীপকের মূলভাব যেন ‘সাম্য’ কবিতারই প্রতিরূপ” — বিশ্লেষণ কর।

মেলা

আহসান হাবীব

ফুলের মেলা পাখির মেলা
আকাশ জুড়ে তারার মেলা
রোজ সকালে রঙের মেলা
সাত সাগরে ঢেউয়ের মেলা ।
আর এক মেলা জগৎ জুড়ে
তাইরা মিলে বোনরা মিলে
মৎ ফড়িরে বেড়ার তারা
নীল আকাশের অপার নীলে
ফুলের বৃকে সুবাস যত
বৃকে-মুখে সের মেখে তাই
পাখির কলকল থেকে
সুর তুলে নেয় তারা সবাই ।
মাতের পথে পাড়ি যখন,
তারার অবাক দাঁপ হেলে নেয়
রোজ সকালের আকাশপথে
আলোর পাখি সেম হেড়ে সেম
সাত সাগরের বৃক থেকে নেয়
ঢেউ তুলে নেয় ভালোবাসার ।
জগৎ জুড়ে যায় হড়িয়ে
যায় হড়িয়ে আলো আশার ।
ভালোবাসার এই যে মেলা
এই যে মেলা তাই-এর বোনের,
এই যে হাসি এই যে খুশি
এই যে ধীতি লক মসের-
কচি সবুজ তাই-বোনদের
আপনি পড়া এই যে মেলা,
এই মেলাতে সিতা চলে
আপন মনে একটি খেলা ।
সারা বেলাই সেই এক খেলা
গড়বে নতুন একটি বাগান,
অনেক ফুল আর অনেক পাখি
সব পাখিদের আলোদা গান-
তার মাঝেই একটি সুরে
সবারই সুর যায় মিলিয়ে
এক দুনিয়া এক মানুষের
স্বপ্ন তারা যায় বিলিয়ে ।



শব্দার্থ ও টীকা

মেলা	-	মিলন বা একত্র হওয়া। উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাবেশ। যেমন বৈশাখি মেলা; এরকম বই মেলা, কৃষি মেলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি।
‘আর এক মেলা জগৎজুড়ে’	-	পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের মিলনের বা একতার উৎসবকে কবি অন্য এক রকমের মেলা বলেছেন।
সুবাস	-	সুগন্ধ।
নিত্য	-	রোজ।
‘তার মাঝেই একটি সুরে বিলিয়ে’	-	ভৌগোলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে মানুষেরা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও মনুষ্যজ্ঞের দিক থেকে সকল মানুষ এক। সেই এক মিলনের সুরে সবারাই সুর মিশে যায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিকারীদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার চেতনা জন্মিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

পৃথিবীর চারদিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখতে পাই বাগানে ফুলের মেলা, গাছে গাছে পাখির মেলা আর আকাশে তারার মেলা। এ হলো প্রকৃতির জগৎ। অন্যদিকে পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ। আর এটিও একটি মেলার মত। আকাশের নীলের মধ্যে যে উদারতা রয়েছে, ফুলের মধ্যে যে পবিত্র সুবাস রয়েছে, পাখির গানের মধ্যে যে সুর রয়েছে সবই পেয়েছে শিশু-কিশোররা। প্রতিদিন আকাশ নিড়ে যে রোদ গুঠে, সেখান থেকে তারা নেয় জীবনের উত্তাপ, সাত-সাগরের বুক থেকে তারা নেয় ভালোবাসার ডেউ। তাই তারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেয় নবীন প্রাণের আশার আলো। কচি সবুজ ভাইবোনদের হাসি-খুশির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সবুজ মনের স্নেহ-প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে, দেশ-কালের সীমানা ভেঙে তারা অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে গড়তে চাচ্ছে একটি সুন্দর জগৎ, সাজানো বাগানের মতো সুন্দর পৃথিবী। এ পৃথিবী হবে সকল মানুষের জন্য একটা অভিন্ন পৃথিবী। পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের ভাষা এক নয়। তবুও সব পাখির গানের মধ্যে যেমন একটা সুরের ঐক্য আছে, তেমনি পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের মনের ভাষার মধ্যেও একটা মিল আছে। পৃথিবীর সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে স্নেহ-ভালোবাসা পূর্ণ একটা সমাজ যদি গড়ে তোলে, তবে এ পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো বিবাদ থাকবে না। তখন পৃথিবী হবে একটা দেশ, মানবসমাজ হবে একটা পরিবার। তখন কত সুন্দর হবে এ পৃথিবী।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীব। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : ‘রাক্ষসেশ’, ‘ছায়াহরিন’, ‘সারাদুপুর’, ‘আশায় বসতি’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা শিততোষ গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি আহসান হাবীব ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. কবিতাটি নিয়ে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।
 খ. কবিতাটিতে ব্যবহৃত প্রকৃতিকেন্দ্রিক শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাতের পথে পাড়ি দিতে শিশু কিশোররা কীসের আলো জ্বলে নেয়?

- ক. চাঁদের
 খ. তারার
 গ. প্রদীপের
 ঘ. জোনাকির

২. 'আরেক মেলা জগৎ জুড়ে' - বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- i মিলনের মেলা
 ii. একতার মেলা
 iii. রঙের মেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
 খ. ii
 গ. i ও ii
 ঘ. i, ii ও iii

৩. সুন্দর সকাল। ফুলের সুবাস। রক্তবেরঙের প্রজাপতি নবনীকে মুগ্ধ করে।

- উদ্দীপকে 'মেলা' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে -

- ক. প্রকৃতির জগৎ
 খ. আরেকটা মেলা
 গ. আশার আলো
 ঘ. অন্তরের ভালোবাসা

৪. কিশোর মোরা উষার আলো আমরা হাওয়া দুর্জ

মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত -

এখানে কিশোরদের 'উষার আলোর' সঙ্গে তুলনা করার দিকটি মেলা কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ শিশু কিশোরদের -

- ক. পাখির পানের সুর আছে
 খ. অন্যরকম জগৎ রয়েছে
 গ. মনের ভাষা এক ও অভিন্ন
 ঘ. আশা ছড়াবার প্রাণশক্তি আছে

সুজনশীল প্রশ্ন

২। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলা শিক্ষক বললেন, '৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছি এই মুক্ত আকাশ-বাতাস, পেয়েছি ছায়া সুনিবিড়-শান্তির নীড়, এই বাংলাদেশ। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'তোমরা আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনের স্বপ্ন। শুধু দেশ ও জাতির জন্য নয়, শিশুরা সারা বিশ্বের সম্ভাবনা।'।

ক. নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায় কারা?

খ. কবি আহসান হাবীব 'আলোর পাখি' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ. বাংলা শিক্ষকের বক্তব্যে 'মেলা' কবিতার কোন মিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "প্রধান শিক্ষকের মস্তব্যে 'মেলা' কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে"- বিশ্লেষণ কর।

শূদার্থ ও টীকা

অক্ষর	- অক্ষর বলতে এখানে বর্ণ এবং বৃহৎ অর্থে মাতৃভাষা বোঝানো হয়েছে।
নির্কর	- স্বরনা।
'এই অক্ষর যেন নির্কর ছুটে চলে অবিরাম'	- আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি, লিখি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তাই করতেন। তাই বলা হয়েছে মাতৃভাষা অবিরাম ছুটে চলেছে। মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা নানা কাজ করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।
'যেন কিছু তারা সিঁছে পাহারা আকাশেতে লিখে নাম'	- এক সময়ে আমাদের এই দেশ পরাধীন ছিল। শাসকেরা রব্রিভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেয়। সে অধিকার আদায় করার জন্য অক্ষরগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে আছে।
'এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে'	- মায়ের কাছ থেকেই আমরা মাতৃভাষা প্রথম শিখি। তাই অক্ষর বা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখলেই মাকে মনে পড়ে যায়।
উপমা	- তুলনা।
অপবৃপ	- খুব সুন্দর।
নুপুর	- পায়ে পড়ার অলংকার।
বৃপকথা	- রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষস প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে কাল্পনিক গল্পকে বলে বৃপকথা।
শিলালিপি	- পাথরে খোদাই করা লেখা, অনেক দিন স্থায়ী করে রাখার জন্য লেখা পাথরে বা তামার পাত্রে লিখে রাখা হতো। এরকম পাথরের ওপর লেখাকে বা ঐ পাথরের খণ্ডটিকে বলা হয় শিলালিপি।
'এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে যুদ্ধ করেছে জয়'	- এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে এই ভাষা দিয়ে আমরা লিখেছি মুক্তির গান। আর সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন থেকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণ বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিন্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বল্পমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের রূপ ধরে। কখনো তার চিত্তে বাজায় সুরের নুপুর।

বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সত্তার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আপন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিভেদ। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অব্যবহিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অব্যবহিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবি মহাদেব সাহা। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব সাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: 'এই গৃহ এই সন্ধ্যাস', 'অন্তিমিত কালের পৌরব', 'টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর', 'ছবি আঁকা পাখির পাখা', 'সরষে ফুলের নদী' ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. জোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি কর (একক কাজ)।
 খ. ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ কর (দলীয় কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এই অক্ষরে কবিতায় কাকে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে ?
 ক. শ্রিয়জনকে খ. মাকে
 গ. দেশকে ঘ. ভাষাকে
২. 'এই অক্ষরে যেন নির্ঝর / ছুটে চলে অবিরাম' - চরণদ্বয় দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন -
 i. মাতৃভাষায় আমরা অতীত ইতিহাস জানি
 ii. বর্তমানকে আমরা মাতৃভাষায় বুঝতে পারি
 iii. আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্নও বুনি মাতৃভাষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i খ. ii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) বাংলার গল্প বাংলার গীত
 তুলিলে এ চিত্র সদা বিমোহিত
 (২) সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে
 তোষে সদা মোরে মধুর সম্মাষে

৩. ১ নং পঙ্ক্তিদ্বয়ে 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটির প্রকাশ পেয়েছে ?

- ক. ভাষাশ্রীতি খ. প্রকৃতিশ্রীতি
 গ. মর্ত্যশ্রীতি ঘ. স্বদেশশ্রীতি

৪. ২ নং পঙ্ক্তিদ্বয়ের বক্তব্যে নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে প্রকাশ পেয়েছে ?

- i. এই অক্ষরে / ডাকনাম ধরে / ডাক দেয় বুঝি কেউ
 ii. এই অক্ষর / আত্মীয়-পর / সকলেরে কাছে টানে
 iii. এই অক্ষরে / মাকে মনে পড়ে / মনে হয়ে যায় নদী

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আর তাই তো কখনো আমি পড়তে পিই নি খুলো এই কালো
এ-কারে আ-কারে
তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা
পড়ে থাকে জুই।
তোমার জন্য জয় করেছে একটি মুহূর্ত
একটি দেশের স্বাধীনতা।
- ক. কঠিন পাথরে কী লেখা হয়?
- খ. 'এই অক্ষরে – মাকে মনে পড়ে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? – ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের 'তারা' – 'এই অক্ষরে' কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে 'এই অক্ষরে' কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে। – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।